যুগশঙ্খ SUPPLI
কলকাতা
সোমবার, ১৯ জুন ২০১৭

৮ পাতার এই ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

থার্ডআই ক্লিক: অফবিট কলকাতা

১ জুলাই থেকে চালু হচ্ছে জিএসটি। তবে এতে আপত্তি অনেকেই করেছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও যেমন আপত্তি তুলেছেন, তেমনই ঘোর আপত্তি চায়ের দোকানিরও। চায়ের ট্যাক্স তো কমেছে, চা-দোকানির কথা কেন, এটাই তো ভাবছেন। চায়ের দোকানিরা নিজেরাও জানেন খদ্দের (পুরুষ ও মহিলা উভয়ই) পাঁচ টাকার চা খাওয়ার পর পঁচিশ টাকার গুটখার পুরিয়া কিনবেন তাঁরই দোকান থেকে। আর মোদি সরকার কিনা এই গুটখার উপরেই ট্যাক্স বাড়াল? আর প্যাকেটের গায়ে ক্যানসারের ছবি? তা তো রাস্তায় পড়ে থাকবে...

ফোটো: **সুজয় চট্টোপাধ্যায়** | লেখা: **তন্ময় মণ্ডল**

আমার চোখে কলকাতা

জয় সরকার (সংগীত পরিচালক)

কলকাতা এমনই একটা আবেগের জায়গা যেটা ভাষায় প্রকাশ করা খুব মুশকিল। কলকাতা ছাড়তে আমার খুব মনখারাপ হয়। আমার বাবা-মায়ের মতো না হলেও প্রায় সেরকমই কাছের এই কলকাতা। কারণ, এই শহরেই আমার জন্ম, বেড়ে ওঠা, চরিত্র তৈরি হওয়া, আমার কাজ। কাজ শেখা, কাজ করা, সাফল্য, ব্যর্থতা— সবই এই শহরটাকে কেন্দ্র করে। কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার কথা কখনও ভাবতেই পারি না। হয়তো কখনও বড় সুযোগ এলে কাজ করতে যাব, তবে যাতে ফিরে আসতে পারি আবার এখানে। এতটাই ভালোবাসি কলকাতাকে যে কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা বলব... প্রথমত গান-বাজনা, নাটক-সিনেমা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি কলকাতার খেলাধুলো। বিশেষ করে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ। ওগুলো আমার কাছে, আমার জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারপর কলকাতার আর একটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল কলকাতার খাওয়া-দাওয়া। এরকম বৈচিত্রময় অসাধারণ সুস্বাদু খাবার আমার মনে হয় না আর কোথাও পাওয়া যায়। কলকাতার চাইনিজ যেমন, বিরিয়ানিও তেমন আর আমাদের বাঙালি খাবার তো রয়েইছে। কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি...। কলকাতার সাথে একটা আবেগের যোগ যেমন আছে তেমনি আত্মারও। কলকাতার 'সিটি অব জয়' নামটা একদম ঠিক।

এখন কলকাতায় গাড়িঘোড়া বেড়ে যাওয়াতে পলিউশনের মাত্রা অনেক বেড়ে গেছে। সেজন্যে প্ল্যান্টেশন করাটা খুব জরুরি। রাস্তা বড় করার জন্য গাছ কাটা হচ্ছে এটা খুবই খারাপ ব্যাপার। আর একটা ব্যাপার হল এখানে যে সমস্ত জাতি আছে, ভাষাভাষি মানুষ আছে সে তো বৈচিত্রের, কিন্তু কলকাতার বাঙালিয়ানা যেন না কমে। নিরাপত্তার দিক থেকে আমার মনে হয় আমার শহর অন্যদের থেকে অনেক এগিয়ে। সেই জায়গাটা যেন ধরে রাখা যায়। যখন রাতে ফিরি তখন দেখি পুলিশ ঠিক কাজই করছেন বড় রাস্তাগুলোতে। তবে একটা জিনিস বলার, সেই দিকটা আরও ভালো করে দেখা উচিত যাতে মেয়েদের নিরাপত্তার কোনও অভাব না হয়। আরও একটা দিক ট্রাফিক রুলটা যেন আরও কঠিন হয়। কারণ কলকাতায় অ্যাক্সিডেন্ট অনেক বেড়ে গেছে। তাছাড়া মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো, রাফ ড্রাইভিং... এগুলো যাতে কেউ সহজে করতে সাহস না পায়।

ডেইলি প্যাসেঞ্জার @ কলকাতা

প্রতিবন্ধকতা মানুষের মনের...

সৌরভ মণ্ডল

সময় যত তাড়াতাড়ি ছোটে হয়তো তার চেয়েও বেশি জোরে ছোটে মানুষের জীবন। তাই এই ট্রেন-বাস-অফিস নিয়ে এতগুলো বছর কীভাবে কাটিয়ে দিলাম সে হিসাব মেলানো বড় কঠিন। ব্যানার্জিদা মাঝে মাঝে ইয়ার্কি মেরে হয়তো ঠিকই বলে, আমাদের জীবনের এক-তৃতীয়াংশ কেটে গেছে ট্রেনে-বাসে।

অফিসে যাতায়াতের পথে ট্রেনের ভিড়টাই একটু সমস্যার। আর বাস বা মেট্রোতে আমাদের জন্য সিনিয়ার সিটিজেন সিট রিজার্ভডই থাকে। এই যাতায়াতের পথে কতরকম ঘটনাই না চোখে পড়ে। এই যেমন সিনিয়র সিটিজেন সিটে আমার পাশে সেদিন একজন এসে বসেছে, দেখে বয়স মনে হল তিরিশ-চৌত্রিশ হবে; সবাই হাঁ করে লোকটার দিকে চেয়ে আছে। ভিড় বাস, অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। এক বয়স্ক ভদ্রলোক তো না পেরে বলেই বসলেন, 'ও ভাই তোমরা ছেলে-ছোকরারা যদি সিনিয়র সিটিজেনে বসো আমরা কোথায় যাবো?' লোকটিও তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল, 'আমি ছেলে-ছোকরা? আসুন এদিকে আমার ভোটার কার্ডটা দেখুন।' গণ্ডগোল তুমুল। বাসভর্তি লোকের কাছে ওই গরমে এটা একটা চরম এন্টারটেনমেন্ট ছিল। এরকম মজার ঘটনা যেমন ঘটে তেমনি অনেক ঘটনা এমনও ঘটে যেগুলো হৃদপিণ্ডের ভেতরটা পুরো নাড়িয়ে দিয়ে যায়।

সেই দিনটাও ছিল একটা গরমকালের দিন। ঘামে সারা শরীর প্যাচপ্যাচ করছে। সিট পাইনি, সিনিয়র সিটিজেনের সিটের সামনেও সেদিন ছ'জন দাঁড়িয়ে। এত গরম যেন মনে হচ্ছে সারা শরীরের সমস্ত জল কেউ শুষে নিচ্ছে। যাইহোক যে-সিটটার সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি শুনলাম সেই সিটের ভদ্রলোক অনেকদূর যাবেন। বুঝে গেলাম আজ কপালের দুর্ভোগ কেউ খণ্ডাতে পারবে না। আমার পাশে দাঁড়ানো একটু কমবয়সি ভদ্রলোকও দেখলাম দরদর করে ঘামছেন আর বারবার কপালের দু'দিকে আঙুল দিয়ে চাপছেন আর চোখ-

মুখ ডলছেন। তিনি যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন তার সামনের সিটের ভদ্রলোককে হঠাৎই বললেন,'দাদা একটু বসতে দেবেন, আসলে শরীরটা খুব খারাপ লাগছে।' প্রত্যুত্তর এলো, 'আপনাদের তো সবসময়ই শরীর খারাপ লাগে। আমারও শরীর খুব খারাপ। স্যরি।' আরও অনেকেই শুনল তবে কেউ ইচ্ছে করেই ভ্রূক্ষেপ করল না পাছে সিটটা ছাড়তে হয়। হঠাৎই প্রতিবন্ধী সিটের একটি ছেলে বলে উঠল—'দাদা এখানে আসুন। আমি দাঁড়াচ্ছি।' যাঁরা শুনল তাদের সবাই চুপ। লোকটি প্রতিবন্ধী সিটে গিয়ে বসলেন এবং মিনিট দু'য়েকের মধ্যে বমি শুরু করলেন। একটা পা নেই, সেই প্রতিবন্ধী ছেলেটা নিজের রুমাল বের করে তাকে দিল। অথচ আমরা ওখানে অতগুলো সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ ছিলাম। আসলে ব্যানার্জিদা হয়তো ঠিকই বলে, শারীরিক প্রতিবন্ধী বলে কিছু হয় না, প্রতিবন্ধকতা মানুষের মনের...

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১৯ জুন ২০১৭

সিজলিং পার্ক স্ট্রিট

সৈকত ঘোষ

জীবনটা একটা ওপেন হাইওয়ের মতো। এখানে স্মৃতিরা হু হু করে বেরিয়ে যায়। আমরা রং-তুলি নিয়ে আঁকতে বসি ক্যানভাস জুড়ে জীবনের খণ্ডচিত্র। সারাদিন কাঠফাটা গরম আর বিকেলে কালবৈশাখী। মনের মধ্যেও যদি এরকমটা হয়, সন্ধের নিয়ন আলোয় ভিজতে ইচ্ছে করে— তাহলে আপনার জীবনে হঠাৎ বৃষ্টির আমেজ নিয়ে হাজির হতে পারে সন্ধের পার্ক স্ট্রিট। কলকাতার বুকে এ এক লাল-নীল-সবুজ কলকাতা। নিজেকে হারিয়ে নতুন করে খুঁজে পাওয়ার ঠিকানা। না আজ আর বেগম আখতার-আশা ভোঁসলে বা জন লেননের টানে কেউ এখানে ছুটে আসে না। এখানকার হেরিটেজ 'মিউজিক ওয়ার্ল্ড'-কে রিপ্লেস করেছে মডার্ন বেকারি ক্যাফে 'আউ বন পেন'। এখানকার লাভ ক্যাপুচিনো সাথে ব্লুবেরি মাফিন আপনার জমজমাট ডেটকে আরও কালারফুল করে দিতে পারে। আর অ্যাম্বিয়েন্স এতটাই সুন্দর যে কী করে সময় কেটে যাবে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন না। তবে আপনি যদি সিজলার ভক্ত হন তাহলে আপনার বেস্ট জায়গা 'পিটার ক্যাট', এখানকার ভ্যারাইটি সিজলার আপনার মন ভালো করে দেবার জন্য যথেষ্ট। চিন্তার কিছু নেই পাশেই মোমো লাভারদের জন্য আছে 'মোমো junction'। এখানে এলে প্যান ফ্রায়েড মোমো একবার ট্রাই করে দেখতেই পারেন।

আপনি কি একঘেয়ে জীবন থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে রিচার্জ করতে চাইছেন? তাহলে মশাই পার্ক স্ট্রিট ছাড়া আপনার গতি নেই...একটু সময় হাতে নিয়ে ঢুকে পড়ুন পার্ক স্ট্রিটের হৃদপিন্ড 'ট্রিইংকাস'-এ। হালকা মিউজিক আর ডার্ক ফ্যান্টাসি আপনাকে হতাশ করবে না। নিজেকে রি-ডিফাইন করতে ঝটপট দুটো টাকিলা শট সাথে রোস্টেড ল্যাম উইথ ডেভিলস সস। ব্যস একেবারে বিন্দাস। মুড অন হতে জাস্ট দু'মিনিট। তবে ড্রিংকস-এর সাথে গানের ককটেল আই মিন নিজের মধ্যে একটু এনার্জি ভরে নিতে চাইলে পছন্দের চার্ট-বাস্টারে সবার প্রথমেই আসবে 'সামপ্লেস এলস'-এর নাম। এখানকার মিউজিকাল অ্যাম্বিয়েন্স আপনাকে অন্য জগতে নিয়ে যাবে। বিনা মেঘে বৃষ্টির মতো হঠাৎ ভিজিয়ে দেবে।

পার্ক স্ট্রিটে বসে ম্যাজিক্যাল ইভনিং চাইলে হাতের কাছেই আছে 'বার-বি-কিউ'। হট অ্যান্ড সাওয়ার স্যুপ সাথে রেড পেপার প্রন্স— নালে ঝোলে ষোলো আনার জায়গায় পুরো আঠেরো আনা। আর একটু বেশি হলে ক্ষতি না থাকলে এখানকার স্ম্যাক্স উইথ চিলড বিয়ার ট্রাই করতে পারেন। অবশ্য জার্নিটা একটু অন্যভাবে শুরু করতে চাইলে এক্সপেরিমেন্ট প্রার্থনীয়। তারা ভরা আকাশ আর কবিতার মতো হ্যালুসিনেশন চাই? থিয়েটার রোডের 'ব্ল্যাক স্কাই বার' তাহলে আপনার ফাইনাল ডেস্টিনেশন। নিঃসন্দেহে এটা কলকাতার সবচেয়ে সুন্দর রুফটপ পাব। নিয়ন আলো, সুন্দর মিউজিক সাথে নাইট ভিউ— একটা আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। এক পেগ স্কচ নিয়ে দিব্যি বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারেন আপনি। আর রাতের কলকাতাকে উপভোগ করতে চাইলে আপনাকে অবশ্যই একবার ঢুঁ মারতে হবে পার্ক স্ট্রিটের পরিচিত নাইটক্লাব 'তন্ত্র'তে। দিল আর দিমাগ দুটোই চিল হয়ে যাবে চোখ বন্ধ করে এটুকু গ্যারান্টি দিতেই পারি।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশে তখন ব্রিটিশ শাসন চলছে। ১৯২২ সালে ভয়ংকর এক বন্যা গ্রাস করল সারা উত্তরবঙ্গকে। সরকার থেকে ইঞ্জিনিয়ারদের এক বিশেষজ্ঞ কমিটি পাঠানো হল সেখানে তদারকি করে দেখে বন্যা প্রতিকারের উপায় বের করতে। তাঁরা পরামর্শ দিলেন নদীর অববাহিকার জলকে ধরে রাখার, যা খুবই খরচসাপেক্ষ ছিল। এক বাঙালি বিজ্ঞানী তখন এলাকার পঞ্চাশ বছরের বৃষ্টিপাত ও বন্যার স্ট্যাটিস্টিক্যাল স্টাডি করলেন এবং জল ধরে রাখা নয়, দ্রুত জল নিকাশির ব্যবস্থা বাতলে দিলেন যার খরচও অতি সামান্য। বলা বাহুল্য, বন্যা প্রতিরোধে সেই প্রকল্পই গৃহীত হল এবং কার্যকরী হল। সেই বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও পরিসংখ্যানবিদ হলেন প্রশান্তচন্দ্র মহালনবিশ। জন্মেছিলেন ২৯ জুন, ১৮৯৩ কলকাতায়। পিতামহ ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পিতা প্রবোধচন্দ্র ছিলেন এই সংগঠনের একজন সক্রিয় সদস্য। এই পরিসংখ্যানবিদের শিক্ষা শুরু রামমোহন রায় স্থাপিত ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুলে। তারপর কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯১২ সালে পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়দের মতো বিখ্যাত সব বিজ্ঞানী। আর এক শিক্ষকের সান্নিধ্য তাঁর জীবন ও কর্মে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি দার্শনিক ও বিশ্বকোষবিদ আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি ইংল্যান্ড যান এবং কেমব্রিজের কিংস কলেজ থেকে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে ট্রাইপস (Tripos) সম্পন্ন করেন। কিংস কলেজ থেকে তিনি সিনিয়র রিসার্চ স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। কেমব্রিজে থাকাকালীনই তিনি গণিতজ্ঞ শ্রীনিবাস রামানুজনের সান্নিধ্যে এসেছিলেন।

লন্ডনে গবেষণা শুরু করার আগে তিনি কিছুদিন ভারতে এসে ছুটি কাটিয়ে যাবেন ঠিক করেছিলেন। তখন বিশ্বজুড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। ঘটনাচক্রে কেমব্রিজেই কার্ল পিয়ারসন সম্পাদিত বায়োমেট্রিকা(Biometrika) জার্নালটি তাঁর নজরে পড়ে এবং তিনি এমনই অভিভূত হন যে পুরো সেটটি কিনে নেন। জাহাজের যাত্রাপথে তিনি তা পড়তে থাকেন এবং মানবকল্যাণে স্ট্যাটিস্টিক্স-এর উপযোগিতার কথা অনুভব করেন। আসলে এটিই তাঁর জীবনের এক টার্নিং পয়েন্ট।

১৯১৫-এর জুলাই মাসে দেশে এলেন তিনি। প্রেসিডেন্সি কলেজে অস্থায়ী শিক্ষক হিসাবে পদার্থবিদ্যা বিভাগে যোগ দিলেন। মনের মধ্যে তখনও আবার ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প। কিন্তু অধ্যাপনার কাজে এমনই মগ্ন হয়ে গেলেন যে আর ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়া হল না। প্রেসিডেন্সিতেই একটি ঘরে তিনি স্ট্যাটিস্টিক্স বিষয়ে কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছিলেন।

কলকাতায় তাঁর পরিচয় হয়েছিল নির্মলকুমারীর সঙ্গে। তিনি ব্রাহ্মসমাজের সদস্য ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের কন্যা। ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩ তিনি নির্মলকুমারীকে বিয়ে করেন।

তাঁর প্রথম রিসার্চ পেপার ' Observations on Anglo-Indians of Calcutta' প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে Records of the Indian Museum-এ। প্রেসিডেন্সি কলেজে নিজের গবেষণাগারে কাজ চালিয়ে গেলেও তাঁর স্বপ্ন ছিল বৃহত্তর আকারে কিছু করার। অবশেষে স্থাপিত হয় ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট (I.S.I.), ১৯৩১ সালে। পরিসংখ্যান শাস্ত্রের উন্নয়নের ক্ষেত্রে যা এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তিনি আজীবন তার প্রধান ছিলেন। অনেকেই জানেন যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মহলানবিশের গভীর সম্পর্কই I.S.I. প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছিল। বিশ্বভারতী ও ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট দুটি প্রতিষ্ঠানেরই উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা ও স্বাদেশিকতার মেলবন্ধন। রবীন্দ্রনাথ যেমন বিশ্বভারতীর মাধ্যমে মানবতাকে আরও কাছাকাছি আনতে চেয়েছিলেন, মহলানবিশও চেয়েছিলেন মানবতার কল্যাণে পরিসংখ্যান। স্ট্যাটিস্টিক্স-এর বাংলা নাম রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন রাশিবিজ্ঞান বা রাশিবিদ্যা এবং প্রতিষ্ঠানটির প্রথম জার্নালে একটি কবিতাও লিখে দিয়েছিলেন। পি সি মহলানবিশও বিশ্বভারতীর প্রথম জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসাবে দশ বছর কাজ করেছিলেন। এরকমই সম্পর্ক ছিল দুজনের।

Large-scale sample survey বা বৃহৎমাত্রার নমুনা জরিপ, স্ট্যাটিস্টিক্স-এর ক্ষেত্রে পি সি মহলানবিশের এক উল্লেখযোগ্য অবদান। তাছাড়া তাঁর জগৎজোড়া খ্যাতি রাশিবিজ্ঞান-এর Mahalanabis Distance নামক ধারণাটির জন্য। স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৪ সালে Weldon Memorial Prize পান এবং ১৯৪৫ সালে লন্ডনে Fellow of Royal Society নির্বাচিত হন। তিনি American Statistical Association -এর ফেলো পদেও নির্বাচিত হন। স্বদেশেও তিনি সম্মানের সঙ্গে অনেক পদ অলংকৃত করেছেন। প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য হয়েছেন। সম্মানিত হয়েছেন পদ্মভূষণ পুরস্কারে। তাঁর স্থাপিত প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। তাঁর জন্মদিন ২৯ জুন জাতীয় পরিসংখ্যা দিবস হিসাবে পালন করা হয়।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১৯ জুন ২০১৭

মেট্রো রেলের সিগন্যাল

বীথি চট্টোপাধ্যায়
(লেখিকা)

ট্যাক্সিটা কিছুতেই সেদিন যেতে রাজি হল না। এদিকে তখন রাত আটটা বেজে গিয়েছে। উনিশশো সাতাশি-অষ্টআশি সালে রাতের শহরে ট্যাক্সি পাওয়া ছিল গুরুতর এক সমস্যা। আমি ছিলাম পার্ক স্ট্রিটের কাছে আর যাব বরানগরে নিজের তৎকালীন আস্তানায়। একটু এগিয়ে যদি মেট্রো করে চলে যেতে পারি তাহলে দমদমে নামতে পারব। সেখান থেকে রিকশা নিয়ে বাড়িতে চলে যাওয়া যাবে। সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নামছিলাম। কারণ শেষ মেট্রো ছেড়ে যাবে রাত ন'টায়। ঘড়িতে তখন আটটা চল্লিশ মতো বাজে। তখনও এমন সময় ছিল যে মেট্রোর টিকিট নিয়ে আমি বুঝতে পারতাম না যে আমি যে ট্রেনের টিকিট কেটেছি সেই ট্রেনটা কোনদিক থেকে কোন প্ল্যাটফর্মে আসবে। লজ্জা করে এসব কথা লুকিয়ে কোনও লাভ নেই যে আমি সত্যি তখনও মেট্রোয় একেবারেই অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি। টিকিট কেটে কাউন্টারের ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম কোনদিকের প্ল্যাটফর্মে ট্রেন আসবে। হেভি পাওয়ারের চশমার ফাঁক দিয়ে একপলক বিরস মুখে তিনি তাকালেন। বাম দিকে, আগে এগিয়ে যান, এগিয়ে যান। যেন খুব বিরক্ত তিনি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে রইলেন। আমি টিকিট হাতে নিয়ে স্টেশন চত্বরে প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে গেলাম। পিছনে পড়ে রইল টিকিট কাউন্টার। প্ল্যাটফর্ম প্রায় জনশূন্য। একা দাঁড়িয়ে আছি। দূরে ট্রেনের লাইন চলে গিয়েছে সুড়ঙ্গপথ ধরে। মাটির তলায় একা থাকলে আমাদের মনে একটা শূন্যতা তৈরি হতে পারে। সেই সাতাশি সাল নাগাদ কলকাতা মেট্রো তখন আমাদের কাছে নতুন একটা ব্যাপার। এখন যেমন মেট্রো আমাদের কাছে খুব স্বাভাবিক, তখন তা ছিল না। আমরা মেট্রো স্টেশনে নামলে তখন চারদিকে চোখ মেলে জায়গাটাকে দেখতাম। জায়গাটা কীভাবে সাজানো, নতুন কী কী সেখানে রয়েছে; এইসব কিছুর দিকে আপনিই চোখ চলে যেত অনেকের। যেমন তখন সেই বছর তিরিশ আগে মেট্রো স্টেশনের এসকালেটর আমাদের কাছে ছিল নতুন একটা ব্যাপার। চলন্ত সিঁড়ি দেখে তখন আমরা বেশ উত্তেজিত হতাম মনে মনে। চলন্ত সিঁড়ি দেখে কেউ অবাক হতে পারে— একথা শুনলে এখনকার ছেলেমেয়েরা হাসবে নিশ্চয়। যাইহোক প্রায় ন'টা বাজতে চলল। চারদিক ফাঁকা। হু হু করে স্টেশনের এয়ার কন্ডিশন থেকে ঠান্ডা হাওয়া ছুটে আসছে। আমি শাড়ির আঁচলে কান-মাথা ঢাকলাম; বেশ ঠান্ডা লাগছিল। চারপাশটাকে ভারি নিস্তব্ধ লাগল। কেন যেন মনে হল চার-পাঁচটা মিনিট যেন কাটতে চাইছে না। সামনে বিরাট ঘড়ি তবু বারে বারে নিজের হাতঘড়ি দেখছিলাম। এইসময় একটি রোগা মতো লোক আমার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। এই স্টেশন চত্বরে এতক্ষণ আমি ছাড়া আর কোনও জীবন্ত প্রাণী চোখে পড়েনি। লোকটি আমার পিছনে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। একটু মাথা নিচু করে সে বসে রইল। ঘড়িতে ঠিক ন'টা বাজে। ট্রেন এল না তো? আমি ছটফট করে উঠলাম। মেট্রো রেল তো আসতে এক মিনিটও দেরি করে না? কী হল আজকে? আমি ঠিক দিকে এসেছি তো? কাকে জিজ্ঞেস করি? ধারে-কাছে কোনও রেল পুলিশকে দেখিনি। বেশ উতলা হয়ে উঠলাম। পিছনে বেঞ্চিতে যে-লোকটি বসে, সে তো দেখছি খুব শান্তভাবেই বসে যেন তার কোনও তাড়া নেই। একটু ইতস্তত করে আমি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম 'আচ্ছা দমদমে যাবে যে গাড়িটা সেটা তো এল না? আপনি কি কিছু জানেন? আপনি কোন দিকে যাচ্ছেন?' লোকটি মুখ তুলল। ফ্যাকাসে ফর্সা মুখ। লোকটি কি একটু অসুস্থ? সে বলল 'আজ আর গাড়ি আসবে না।' আমি আরও চঞ্চল হয়ে উঠলাম। 'সে কী? কেন? ন'টার ট্রেনটা আসবে না?' লোকটা মাথা নাড়ল। 'লাইন জ্যাম হয়ে গেছে। একটা সুইসাইড আছে দুটো স্টেশন আগে।' আমি আকাশ থেকে পড়লাম যেন।' 'মানে? কী বলছেন? সুইসাইড আছে মানে?' লোকটা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল 'বাংলা বোঝেন না আপনি? একজন সুইসাইড করেছে লাইনে রেলের সামনে ঝাঁপ দিয়ে, বডি দলা পাকিয়ে রেলের নীচে ঢুকে গেছে। বডি না বের করলে গাড়ি এগোবে কী করে? 'লোকটি অল্প হাসল। আমি ভাবছিলাম কী করব। আমাকে তো তাহলে স্টেশন থেকে ফিরে যেতে হবে। উপরে উঠে ট্যাক্সি খুঁজে ধরতে হবে। অথবা বাসে করেও যেতে পারি। আমি একটু আফসোস করলাম। ইস্ ট্যাক্সিটা যখন যেতে রাজি হল না তখনই কেন যে প্রথমেই বাসে উঠে পড়িনি... এতক্ষণ তাহলে অর্ধেক রাস্তা পৌঁছে যেতাম। একটু আরামে যাব ভেবে কেন যে মেট্রো ধরতে এলাম। এখন নটা বেজে পাঁচ, কখন বাস পাব কে জানে? আচ্ছা লোকটা ঠিক কথা বলছে তো? সত্যি এই লাইনে মেট্রো আজ আর আসবে না? কেউ লাইনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বলে? তাহলে লোকটা এখানে বসে আছে কেন? পথঘাটে এমন অনেক লোক হামেশাই দেখা যায় যারা অনেকসময় না জেনে ভুল রাস্তা বলে দেয় বা বিনা কারণে ভুল কথা বলে। তাতে মানুষ খুবই ভোগান্তিতে পড়ে মাঝে মাঝে। আমি মনে মনে দোনামোনা করছিলাম। হয়তো কোনও কারণে আজ ট্রেন আসতে দু-দশ মিনিট দেরি হচ্ছে। ঘড়িতে নটা পাঁচ। আর পাঁচ মিনিট কি দেখব? যদি ট্রেন তার মধ্যে এল ভালো, নয়তো উপরে উঠে বাসে করে ফিরব? লোকটি হঠাৎ বলল, 'ট্রেন আসবে না। ট্রেনের তলায় বডি ঢুকে রয়েছে।' আমার ভুরু আপনিই কুঁচকে গেল সেই কথা শুনে। স্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কী করে জানলেন? আপনার হাতেই তো দেখছি রেলের টিকিট। যদি এই লাইনে ট্রেন নাই আসে তাহলে টিকিট কেটে আপনি এখানে বসে আছেন কেন? আপনাকে কে বলল যে ট্রেন আসবে না?' লোকটি মাথা নিচু করল। 'বেশ, দাঁড়িয়ে থাকুন আপনি। সারারাত স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকুন। মনে হচ্ছে আপনাকেও এই লাইন টানছে। আপনার মন চাইছে না এখান ছেড়ে যেতে।' আমি চমকে উঠেছি। পাগল না মাতাল লোকটা। কী সব উলটোপালটা বকছে। আমাকে লাইন টানছে মানে? দিশেহারা লাগল। লোকটি তার কথা থামায়নি। সে বলে যাচ্ছিল। 'মানুষের যে কত দুঃখ। মিল লক আউট। মালিকের সঙ্গে ইউনিয়নের তলায় তলায় কত ভাব। ইউনিয়নের লিডাররা মিলের গেটে তালা মেরে দেবে। মালিকের কাছে টাকা খাবে যাতে অনেক লেবার ছড়িয়ে ছিটকে কাজ ছেড়ে দেয়। বাড়িতে ভাঙা ছাদ, রোগা রোগা ভাইবোন, কতদিন বাড়িতে ভাত হয়নি। শুধু শুকনো রুটি। সবকটা আশা করে আছে কখন খোকা দুটো বেশি পয়সা আনবে। সেদিন ভাত হবে। রোজই জিজ্ঞেস করবে। হ্যাঁ রে চাকরির কিছু হল? কাল যেখানে গেলি তারা কিছু বলল? বাবা রোজ কাজ খুঁজতে বেরোবে। ভাইটা টিউশন নিচ্ছিল কাল ছাড়িয়ে দিলাম। বাবা আজও সকালে বেরিয়েছে। একটা বুড়ো মানুষ দোকানে দোকনে ঘুরে কাজ খুঁজেছে আর লোকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। রাস্তার ধারে বসে বুড়োটা ধুতির খুঁটে চোখ মুছেছে। এই শহরে কেউ সেটা দেখেনি। কিন্তু বলুন তো দিদি খোকনই-বা টাকা আনবে কোথা থেকে? মিল বন্ধ। কে দেবে বলুন তো নতুন চাকরি?' আমার পা মাটির সঙ্গে আটকে গিয়েছিল। লোকটির দৃষ্টিতে কোনও বজ্জাতি ছিল না। তার কথার কোথাও ছিল না কোনও কৃত্রিমতা। আমি বেঞ্চিতে তার পাশে বসলাম, 'মিল বন্ধ? কোথায় তোমার মিল? বাড়ি কোথায়? কেন বসে রয়েছ এখানে?' লোকটি হাতের টিকিটটা প্ল্যাটফর্মের মেঝেতে ফেলে দিল। 'আর কোথায় যাব দিদি? ট্রেন তো আজ আর আসবে না। সামনের স্টেশনে বডি ঢুকে রয়েছে ট্রেনের তলায়। খুব কষ্ট।' আমি সোজা তাকালাম লোকটার সাদা মুখের দিকে। তারপর আর কিছু মনে নেই। চোখ মেলে দেখলাম আমার স্বজন-পরিজন আমার সামনে। আমি এল সে কি আর কেউ অত মনে রাখে। যাঁরা আমাকে উদ্ধার করে বাড়িতে খবর দিয়েছিলেন তাঁরা কেউ ওদের বলেনওনি যে ট্রেন সেদিন দেরি করছিল কিনা। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন মাটির নীচে গেলে কেউ কেউ এক্সট্রিম সাফোকেশনে ভুগে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেই পারেন। কেউ হঠাৎ গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতে পারেন। কেউ আবার নানারকম উদ্ভট হ্যালুসিনেশনেও ভোগেন মাটির তলায় গেলে। এসব কিছুই রেয়ার আন্ডারগ্রাউন্ড সিনড্রোম বলে একটা লক্ষণ। অল্প কিছু মানুষ এই সিনড্রোমে আক্রান্ত হন। তাঁরা এমন অনেক কিছু দেখেন যা তাঁদের অবচেতনে চাপা রয়েছে। সেই অবচেতন বাস্তবের রূপ ধরে হ্যালুসিনেশন হয়ে সামনে চলে আসে কখনও কখনও। ডাক্তারবাবু তাঁর কয়েকটি ওষুধ বদলে দিলেন।

হ্যালুসিনেশন? রঙচটা সাদাকালো স্ট্রাইপ দেওয়া জামা পরা ফ্যাকাসে মুখের কোনও লোকের সঙ্গে তার মানে আমার আদৌ দেখাই হয়নি। অসুস্থ হয়ে দু-তিনদিন কাগজ পড়িনি। না পড়া কাগজে তন্নতন্ন করে আমি কিছু খুঁজছিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমার বুকের কাছে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। খবরটা বেরিয়েছে। মেট্রোয় ঝাঁপ দিয়েছিল সেদিন কেউ। তার কাজ

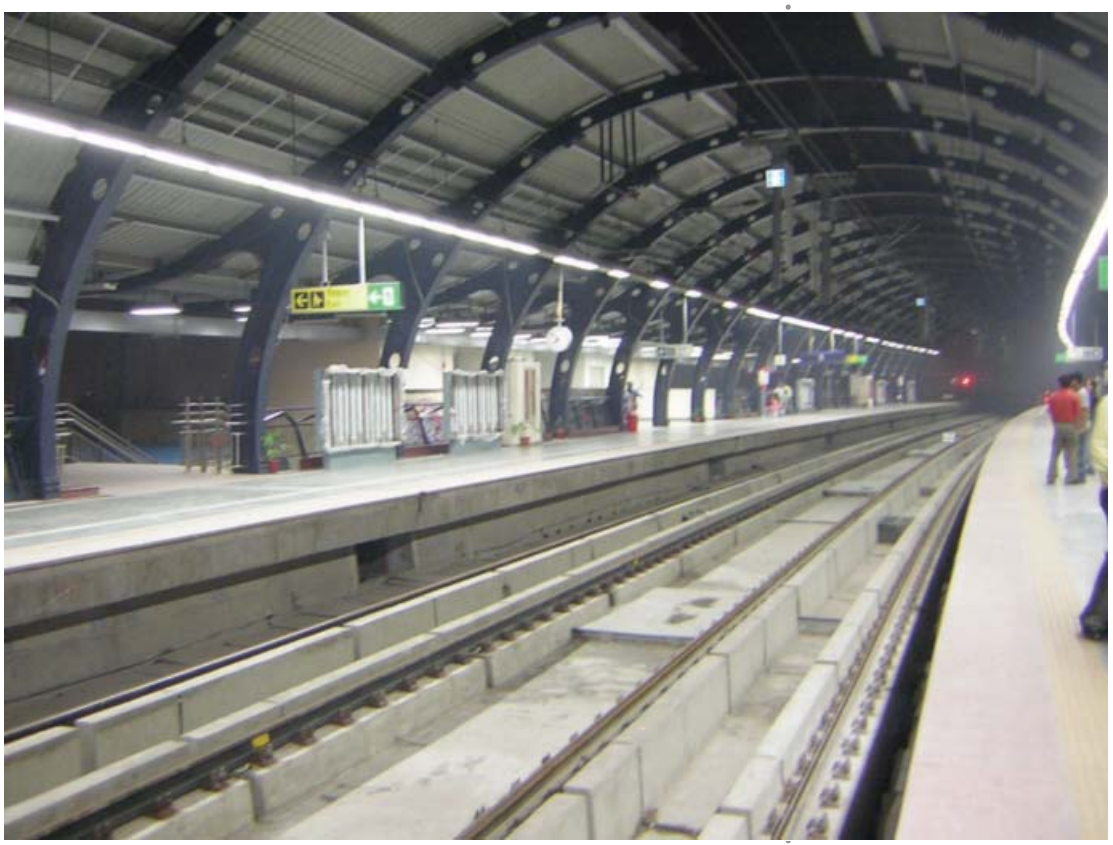

বিছানায় শুয়ে। ধড়ফড় করে উঠে বসতে যাচ্ছিলাম। প্রায় সকলে মিলে আমাকে উঠতে নিষেধ করল। শুনলাম যে আমি নাকি মেট্রো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। কয়েকজন যাত্রী আমাকে উদ্ধার করে। ব্যাগ থেকে পরিচয় খুঁজে পেয়ে বাড়িতে খবর দেয় পুলিশ। আমার বাড়ির লোকজনকে আমি শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম। দমদমের ট্রেনটা কি সেদিন ছেড়েছিল ঠিক সময়ে? কেউ-ই ঠিক জানে না ট্রেন এসেছিল কিনা। কারুর মনে নেই। আমি বারবার জিজ্ঞেস করছিলাম, 'যে ট্রেনে আমার দমদম আসবার কথা ছিল সেই ট্রেনটা কি কোনও কারণে আসেনি সেদিন?' বাড়ির লোক ঠিক যেন বোঝেনি আমার প্রশ্ন। ট্রেন এল কি না চলে গিয়েছিল। অনটনের সংসার... কাউকে আমি কিছু বলিনি তারপরে। সেদিনের সেই লোকটির মুখটা সারাজীবন আমার মনে ছবি হয়ে থেকে গিয়েছে। কয়েক বছর পরে ভিড়ে ভিড়াক্রান্ত মেট্রো স্টেশনে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ আমার মনে হয়েছে বেঞ্চিতে ওই ডোরাকাটা শার্ট, ফ্যাকাসে মুখে বসে ওকে? সেই খোকন না? আমাদের যেন চোখাচোখি হয়েছে, যেন খোকনের দৃষ্টি আমাকে বলছে— তুমি ঠিকই দেখছ। হ্যাঁ, আমি সেই সেদিনের খোকনই। এই শহর আমাকে একদিনেই ভুলে গিয়েছে। তুমি ভুলতে পারোনি। খোকন আমার জন্যে হাত নেড়েছে ভিড়ের ভিতর থেকে আলাদা হয়ে। আর আমি ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে ট্রেনে উঠে পড়েছি নীরবে।

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ১৯ জুন ২০১৭

দু’শতকে কতটা বদলেছে কলকাতার যৌনপল্লি

সৌম্য নিয়োগী

[নিষিদ্ধপল্লিতে মুখ ঢেকে যাওয়ার দিন অনেকদিন আগেই শেষ। যৌনকর্মীরাও এখন আর ‘বেশ্যা’ নন। বিশ্বায়নের যুগে তাঁরা এখন ‘কলগার্ল’ বা ‘এসকর্ট’। সোনাগাছি বা হাড়কাটা গলি কিন্তু রয়ে গেছেই। তবে হোয়াটসঅ্যাপ প্রজন্ম কিন্তু ওই সব নোংরা জায়গায় নারীশরীরের সঙ্গলাভের চেয়ে নিজের বিছানা বা হোটেল-রিসর্টেই আগ্রহী। কিন্তু এমনটা তো চিরকাল ছিল না। কলকাতার যৌনপল্লিগুলির ইতিহাস কিন্তু এই শহরের ইতিহাসের থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।]

নব্যবাবুদের বেশ্যা-বাইজি বিলাস

‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’-য় উত্তর কলকাতার দুর্গা বিসর্জনের বর্ণনা দিতে গিয়ে কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখছেন, ‘ক্রমে শহরের বড় রাস্তা চৌমাথা লোকারণ্য হয়ে উঠল, বেশ্যালয়ের আলাপীতে পুরে গেল, ইংরেজি বাজনা, নিশেন, তুরুকসোয়ার ও সার্জেন সঙ্গে প্রতিমারা রাস্তায় বাহার দিয়ে বেড়াতে লাগলেন।’ বা রবীন্দ্রনাথের ভাইপো ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন, ‘চিৎপুর রোডের এই অংশের দুই পার্শ্ব সেকালে বড় অধিক সংখ্যায় বারবনিতাদিগের অধিকৃত থাকিত।’ এত ভনিতার অর্থ সেদিনের প্রাচীন কলকাতার বারবনিতাদের আজকের যৌনকর্মী হয়ে ওঠার কথাই জানাব। কলকাতা বা বাংলার যৌনকর্মীদের কথা বলতে গেলে সবচেয়ে পুরনো যে প্রথার কথা মনে পড়ে তা হল, যৌনকর্মীদের ঘরের মাটি না হলে দুর্গার প্রতিমাই তৈরি হয় না। কুমোরেরা বলেন, ওটা অতি আবশ্যিক। আমাদের বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকেই এটা জেনে এসেছি। ব্যস। কেন জরুরি, তা অবশ্য তাঁরা তা ব্যাখ্যা করতে পারেন না। কিন্তু সত্যিই কেন জানেন, পুরাণে দুর্গা কেবল যুদ্ধেরই দেবী নন, প্রজননেরও দেবী। দেবীর পুজার নানা উপাচারে প্রজননের সেই প্রতীকগুলি রূপক হিসাবে লুকিয়ে রয়েছে। অষ্টপ্রহর প্রজননের প্রক্রিয়া চলে শুধুই যৌনকর্মীদের পল্লিতে। তাই সেখানকার মৃত্তিকাকেই সবচেয়ে ‘পবিত্র’ বলে মেনেছেন শাস্ত্রকারেরা।

কলকাতার যৌনকর্মীদের মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়— ১) রেডলাইট এলাকায় বসবাসকারী, ২) রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো যৌনকর্মী ও ৩) যেসব মেয়েদের পূর্বপুরুষরা প্রথাগতভাবে পারিবারিক ভরণ-পোষণের জন্য নাচগান পরিবেশনের উপর নির্ভর করতেন। তাঁদের অনেকে আজকাল বাইজি, নাচনি ইত্যাদি নামে যৌনকর্মে নিযুক্ত থাকেন। কলকাতার বারবনিতাদের কথা বললেই যে দু’টি পাড়ার কথা উঠে আসে তা হল শোভাবাজার বা সোনাগাছি ও কালীঘাট। কলকাতার অতি দুই প্রাচীন যৌনপল্লি। এছাড়াও কলকাতায় কলেজ স্ট্রিটের কাছে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিট ও নবীনচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের যৌনপল্লির কথা বলতেই হবে। যা ‘হাড়কাটা গলি’ নামে খ্যাত। এছাড়া খিদিরপুরেও একটি ছোট যৌনপল্লি রয়েছে। সেকালে জাহাজের খালাসিদের জন্যই জায়গাটির রমরমা ছিল। বিদেশিনীদেরও সেখানে দেখা মিলত। এ সবই কিন্তু বাবু আমলের কথা। এখন অবশ্য আরও কয়েক ধরনের যৌনকর্মীর দেখা মেলে। তারা হল, ১) কলগার্ল বা এসকর্ট সার্ভিস। অর্থাৎ কি না হাই প্রোফাইল যৌনকর্মী। ২. পুরুষ বা হিজড়ে যৌনকর্মী যাঁরা টাকার বিনিময়ে প্রধানত সমকামী বা উভয়কামী পুরুষদের যৌনক্ষুধা মেটান। এছাড়া শিশু-কিশোরী যৌনকর্মীদের কথাও বলা দরকার। যদিও আজকাল রেডলাইট এলাকায় এই ধরনের যৌনকর্মীদের সংখ্যা যথেষ্টই কমে গেছে।

উত্তর কলকাতার সাবেক দর্জিপাড়া এলাকা, রাস্তার নাম গৌরীশঙ্কর লেন। সারা দুনিয়ার কাছে এটাই সোনাগাছি, এশিয়ার বৃহত্তম যৌনপল্লি। ঔপনিবেশিক কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলের বাবুদের বাবুয়ানি টিকিয়ে রাখতেই তৈরি করা হয়েছিল এই বিশাল যৌনপল্লি। সেই বাবু কলকাতার আমল থেকে এই হোয়াটসঅ্যাপ আমল— সোনাগাছি কিন্তু আছে সোনাগাছিতেই। আজও অক্ষুণ্ণ তার সুনাম। কিন্তু দিন দিন বড় হয়ে যাচ্ছে সোনাগাছি। আর এটাই বড় দুঃখের কথা সোনাগাছির কাছে। কিংবদন্তি বলে, বহু কাল আগে এই এলাকার মালিক ছিলেন সানাউল্লাহ বা সোনা গাজি নামে এক পির। এখনও সেই গাজির মাজার এই এলাকায় রয়েছে। সেই ‘সোনা গাজি’ নামই কালে কালে ‘সোনাগাছি’ হয়ে যায়। বর্তমানে স্থায়ী ও অস্থায়ী প্রায় ১০,০০০ যৌনকর্মীর ঠিকানা এটাই। বাবু আমলে কিন্তু সংখ্যাটা এত বেশি ছিল না। পাশেই শোভাবাজারের মতো বনেদি এলাকা ছিল। ফলে বাবুদের যাওয়ার বড় জায়গা ছিল এই পাড়াই।

অন্যদিকে কালীঘাটও ছিল বনেদি বাবুদেরই আনাগোনা। শাক্ত-বাবুরা মা কালী-র পুজো দেওয়ার আগে বা পরে আদিগঙ্গায় ডুব দিয়ে এসে এই পবিত্র কাজটি সম্পন্ন করতেন। ব্রিটিশদের পরিসংখ্যান বলছে, ১৮৫৩ সালে এক পুলিশ রিপোর্টে কলকাতার তৎকালীন চিফ ম্যাজিস্ট্রেট এলিয়ট কলকাতা শহরে ৪০৪৯টি বেশ্যাঘর আছে বলে স্বীকার করেন। যাতে বাস করতেন মোট ১২,৪১৯ জন যৌনকর্মী। অর্থাৎ ঘরপ্রতি যৌনকর্মীর সংখ্যা ছিল ৩ জনেরও বেশি। ১৮৬৭ সালে কলকাতার হেলথ অফিসার ফেভার-টোনার যৌনকর্মীর সংখ্যা ৩০,০০০ জন নির্ধারণ করেন। ১৯১১ সালে এই সংখ্যাটা দাঁড়ায় ১৪,২৭১ জনে। ১৯২১ এবং ১৯৩১ সালের আদমশুমারিতে যৌনকর্মীদের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১০,৮১৪ এবং ৭,৯৭০ জনে। কিন্তু ১৯৩২ সালে বেঙ্গল উইমেনস ইউনিয়নের সভানেত্রী দাবি করেন যে পুলিশের হিসাবে কলকাতার যৌনকর্মীর সংখ্যা ২০,০০০ জন। কিন্তু প্রকৃত সংখ্যাটা এর থেকে জানা যায় না। তবে কলকাতার পুরনো ইতিহাস পড়ে যেটুকু বোঝা যায়, তা হল কলকাতায় বেশ্যাদের রমরমাই ছিল। আর বেশিরভাগ বেশ্যালয়গুলিই ছিল ধনী জমিদার পরিবারগুলির তৈরি। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী’ থেকে জানা যায় খোদ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঠাকুরদা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর কলকাতার একটি এলাকাতেই তেতাল্লিশটি বেশ্যালয়ের মালিক ছিলেন।

আসলে তখনকার মানুষদের নীতি-নৈতিকতার বিষয়টি আজকের মতো ছিল না। হিন্দুসমাজে এমনও মনে করা হতো যে বেশ্যারা এই সমাজকে পরিষ্কার রাখে। যেখান থেকে এসেছে ওই বেশ্যার দরজার মাটি-র শাস্ত্রবিধান। সেই সময়কার বাবুসমাজের যে যে গুজবগুলি পরে ড. আবুল আহসান চৌধুরী ‘অবিদ্যার অন্তঃপুরে, নিষিদ্ধ পল্লীর অন্তরঙ্গ কথকতা’ বইতে উঠে এসেছে তা হল, নারী আন্দোলনের ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়ের একজন রক্ষিতা ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর পতিতা সুকুমারী দত্তের প্রেমে মজেছিলেন। সাহিত্যিক মীর মোশারফ হোসেন নিয়মিত বেশ্যা পাড়ায় যেতেন তা তিনি নিজেই তার ডাইরিতে লিখে গেছেন। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিয়মিত পতিতালয়ে যাওয়ার কথাও জানা যায়। এমনকী নিষিদ্ধ পল্লিতে গমনের ফলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সিফিলিসে আক্রান্ত হওয়ার খবর তার জীবদ্দশাতেই ১৯২৮ সালে ‘বসুমতী’ ও ‘অবতার’ পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে ওই সময় কলকাতায় বিশেষ কারণে যৌনরোগ সিফিলিসের প্রকোপ ছিল। ফলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সিফিলিস রোগের খবরটা তেমন গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু এ কথার বেশিরভাগটাই গুজব। এর পিছনের সত্যতা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মনে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এমনকী সেই সময়কার বাবুসমাজে যেভাবে ব্রাহ্ম বা প্রগতিশীল-নারী আন্দোলনকারীদের হেয় করার চেষ্টা হতো সে কথাও আমরা নানা বই থেকে জানতে পারি। বলা হতো, বেশ্যাদের প্রস্রাব থেকে সিফিলিস ছড়াচ্ছে।

শুধু তাই নয়, ১৮৬০ সালে ইংরেজ সৈন্যদের মধ্যে ৬০% এর বেশি যৌনরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। যে-কারণে, ১৮৬৪ সালে ব্রিটিশ সরকার ক্যান্টনমেন্ট অ্যাক্ট পাশ করায়। যে আইন অনুসারে সেনা ছাউনিগুলোতে ইংরেজ সৈন্যদের জন্য তৈরি হল আলাদা বেশ্যালয়। সেখানে যেসব বেশ্যারা আসতেন তাঁদের রেজিস্ট্রি করে পরিচয়পত্র দেওয়া হতো। যৌনরোগ থেকে তাদের মুক্ত রাখার জন্য নিয়মিত হাসপাতালে চেক-আপও করা হতো। এমনও জানা যায়, বড়লোক বাড়ির রক্ষিতা বেশ্যারা জুড়িগাড়ি ছাড়া কলকাতা শহরের বুকে হাওয়া খেতেও বেরোতেন না।

এদিকে স্বাধীন ভারতের বেশ্যাবৃত্তি-সংক্রান্ত আইনটি প্রথম থেকেই অস্পষ্ট। ১৯৫৬ সালে এই বিষয়ে প্রাথমিক আইনটি পাশ হয়েছিল।

কলকাতা
যুগশঙ্খ
SUPPLI
সোমবার, ১৯ জুন ২০১৭

যার নাম, অনৈতিক পাচার (দমন) আইন। এই আইন অনুসারে, বেশ্যারা কেবল ব্যক্তিগত স্তরেই তাদের ব্যবসা চালাতে পারে। কিন্তু আইনত তারা প্রকাশ্যে খরিদ্দার ধরতে পারে না বা দালালি করতে পারে না। প্রকাশ্য স্থানের ২০০ গজের মধ্যে যৌনকর্মীর দেহব্যবসা চালানোর ওপর আইনের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অথচ, একজন মহিলা বৈষয়িক লাভের জন্য তার দেহ ব্যবহার করতে পারে। তা আইনত অপরাধ নয়। অন্যান্য পেশার মতো যৌনকর্মীরা কোনও শ্রম আইনের আওতায় পড়ে না, কিন্তু যদি তারা অন্যান্য নাগরিকদের মতোই অধিকার পেতে চায়, তবে তাদের উদ্ধারকৃত হওয়ার এবং পুনর্বাসনের অধিকার রয়েছে। যদিও বর্তমান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যৌনকর্মীদের জন্য নানা পুনর্বাসন প্যাকেজের আশ্বাস দিয়েছে।

বেশ্যা থেকে এসকর্ট ও যৌনকর্মীদের অধিকার আন্দোলনের ইতিহাস

বাবু কলকাতার জলাঞ্জলি ও উত্তর কলকাতার যৌথ পরিবার ভাগাভাগির সময়েও স্বমহিমাতেই বেঁচে ছিলেন যৌনকর্মীরা। উত্তাল কমিউনিস্ট আন্দোলন, নকশাল আন্দোলনের সময় যৌনকর্মীদের অনেকেরই এসব আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকতে দেখা যায়। তাই তখন থেকেই পুলিশি অত্যাচার বাড়ছিল এই এলাকায়। বিভিন্ন নিষিদ্ধ নেশার রমরমাও তখন থেকেই বাড়তে থাকে। সত্তর দশকের শেষে কলকাতার যৌনপল্লিগুলো হয়ে উঠল অপরাধ ও অপরাধীদের আখড়া। একই সঙ্গে বাড়ল পুলিশ প্রহরা। কলকাতার যাবতীয় কুখ্যাত দুষ্কৃতীর গা ঢাকা ও কাম চরিতার্থ করার পছন্দের গন্তব্য হয়ে ওঠে সোনাগাছি ও কালীঘাট। বর্তমান যৌনকর্মীদের একটা বড় অংশ এসেছেন নেপাল আর বাংলাদেশ থেকে। বাবু আমলের যৌনপল্লি থেকে হোয়াটসঅ্যাপ আমলের যৌনপল্লি হয়ে ওঠার রাস্তায় অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছে যৌনকর্মীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন। যা সাবালক করে তুলেছে কলকাতার যৌনকর্মীদের। যার কল্যাণে কর্পোরেট যৌনকর্মী নামক এক নতুন শ্রেণি উঠে আসলেও সোনাগাছি তার ঐতিহ্য একেবারেই হারায়নি, বরং যৌনপল্লিগুলির মধ্যেকার বন্ডিংকেও দৃঢ় করেছে। কিন্তু তারপরেও সোনাগাছিই একমাত্র যৌনপল্লি যেখানে এক রাতের জন্য ১৫০-২০০ টাকা থেকে ১০-১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ হয়ে যেতে পারে। যা গোটা ভারতে খুঁজেও পাওয়া যাবে না।

এদিকে, বর্তমানে বেশিরভাগ যৌনকর্মী ফাঁদে পা দিয়ে যৌনকর্মী হয়েছেন। কেউ কেউ অবশ্য দৈব-দুর্বিপাকে চরম দুর্দশার মুখে পড়ে বেঁচে থাকার তাগিদে এই পেশায় যোগ দিতে বাধ্য হয়েছেন। এদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরে যাওয়ার আর কোনও উপায় নেই। তাঁর কারণ, নিজের শরীর বেচা ছাড়া তাঁদের আর কিছু জানা নেই। এর পরে রয়েছে এইচআইভি এইডস-এর প্রকোপ। কারণ, জীবিকার জন্য তাঁদের অনেক খদ্দেরকে যৌনতৃপ্তি দিতে হয় এবং অধিকাংশ খরিদ্দার কন্ডোম ব্যবহার করতে চান না। ১৯৯২ সালে সোনাগাছি এলাকায় যৌনকর্মীদের মধ্যে এইচআইভি এইডস নিবারক প্রকল্প কার্যকারী হয়। প্রকল্পের অঙ্গ হিসাবে কিছু বাছাই করা যৌনকর্মীকে এইডস ও কন্ডোম ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়ে সামান্য মাসোহারার বিনিময়ে 'পিআর এডুকেটর' হিসাবে নিয়োগ করা হয়। তাদের কাজ ছিল অন্যান্য যৌনকর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের এইচআইভি এইডস সম্পর্কে সচেতন করা ও কন্ডোম ব্যবহারের পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়া। কয়েকদিনের মধ্যেই বোঝা যায় যে যৌনকর্মীরা রোগের ভয়ে কন্ডোম ব্যবহার করতে আগ্রহী হলেও তাদের খরিদ্দাররা এই 'কাপুরুষোচিত' কাজে একেবারেই আগ্রহী নয়। কোনও যৌনকর্মী কন্ডোম ব্যবহারে অনিচ্ছুক খরিদ্দারকে প্রত্যাখ্যান করলেও, তিনি সহজেই সামান্য বেশি টাকায় অন্য যৌনকর্মীকে কন্ডোম ছাড়া যৌন সংসর্গে রাজি করিয়ে ফেলতে পারেন। ফলে এই প্রকল্প প্রথমেই মুখ থুবড়ে পড়ে।

১৯৯২ সালে জনস্বাস্থ্যমূলক কাজে ব্রতী এইডস বিশেষজ্ঞ ড. স্মরজিৎ জানার উদ্যোগে যৌনকর্মীদের কাছে আগত খরিদ্দাররা যাতে কন্ডোম ব্যবহার করেন, তা সুনিশ্চিত করার জন্য 'সোনাগাছি প্রোজেক্ট' বলে একটি প্রকল্পটি শুরু করেন। যা যৌনকর্মীদের সমবায়। এই সংস্থাটির নিরলস প্রচেষ্টায় আজ যৌনকর্মীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার ৫ শতাংশে নামানো সম্ভব হয়েছে। যা কিনা রাষ্ট্রসংঘের এইডস নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে একটি 'বেস্ট প্র্যাকটিস মডেল' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

১৯৯৩ সালে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ বিভাগের সমীক্ষায় বলা হয়েছে, কলকাতা ও হাওড়া শহরে মোট ১৯টি যৌনপল্লি রয়েছে। প্রতিটি পল্লিতে যদি গড়ে ২০০ করে বাড়ি রয়েছে ধরা হয়, তাহলে মোট বাড়ি আছে ৩৮০০টি। এবং বাড়িপ্রতি ৩ জন করে ধরলে যৌনকর্মীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১১,৪০০ জন। পথেঘাটে ঘুরে বেড়ানো যৌনকর্মীর সংখ্যা যদি ৮,৬০০ ধরা হয় তবে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২০,০০০ জনে। বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও বিশ্বায়নের কল্যাণে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত পাড়ায় পাড়ায় যেভাবে মধুচক্র, হাই প্রোফাইল ক্লায়েন্ট-এসকর্ট সার্ভিসের যৌনকর্মীদের সংখ্যাও প্রায় সমানুপাতিক ধরে নেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে কলকাতা শহরে এই ক'বছর আগেও ৪০,০০০ যৌনকর্মী ছিলেন বলে ধরা যেতে পারে। এখন সংখ্যাটা কত হয়েছে সে সম্পর্কে কেউই ধারণা দিতে পারেননি।

তাই যখন কন্ডোমের ব্যবহার বাড়ছিল না, তখন সোনাগাছির পিআর এডুকেটররা, প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা ডাক্তার, সমাজসেবীদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করলেন যে, ওখানকার যৌনকর্মীদের এক ছাতার তলায় আসতে হবে। এবং খরিদ্দারদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে কন্ডোম ব্যবহারের দাবি তুলতে হবে। আর সেই লক্ষ্যেই ১৯৯৫ সালে গঠিত হল প্রথম যৌনকর্মীদের সংস্থা 'দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি'। সংস্থার প্রাথমিক লক্ষ্য স্থির করা হল যৌনকর্মীদের অধিকার আন্দোলন। অর্থাৎ যৌনকর্মীদের পেশার স্বীকৃতি ও শ্রমিকের স্বীকৃতি দাবিতে, নাগরিকদের যা ন্যূনতম অধিকার আছে যৌনকর্মীদেরও সেই সব অধিকারের দাবিতে শুরু হল লড়াই। প্রথম আন্দোলনটা অবশ্যই ছিল খরিদ্দারদের বিরুদ্ধে। যাতে তারা যৌন সংসর্গে কন্ডোম ব্যবহারে মানা না করতে পারেন। এবং শেষ পর্যন্ত কন্ডোম ছাড়া যৌন সংসর্গে যৌনকর্মীদের প্রত্যাখ্যানের চাপে খরিদ্দাররাও কন্ডোমের ব্যবহার মেনে নিতে লাগলেন। এবং দ্রুত হারে কন্ডোম ব্যবহার শুরু হওয়ায় দেশের অন্য যৌনকর্মীদের থেকে কলকাতায় যৌনরোগের সংক্রমণও কমতে থাকল।

এবার শুরু হল সামাজিক স্বীকৃতি আদায়ের সংগ্রাম। ২০০১ সালে কলকাতা ইতিহাস তৈরি করে ফেলল। ২০০১ সালের ৩ মার্চ কয়েক হাজার যৌনকর্মী তাদের অধিকার আদায়ে একটি সমাবেশের আয়োজন করে। যা কিনা ছিল সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় যৌনকর্মীদের নিজস্ব উদ্যোগে হওয়া প্রথম আন্দোলন। এর পর থেকে প্রতিবছর ৩ মার্চ পালন করা হয় 'আন্তর্জাতিক যৌনকর্মী অধিকার দিবস' হিসাবে। সেখানেই যৌনকর্মীরা প্রথম তাঁদের অধিকার এবং তাঁদের প্রতি বৈষম্যের বিষয়গুলি সমাজের সামনে তুলে ধরেছিলেন। সম্মেলন চলেছিল চারদিন ধরে। প্রত্যেকদিন ছিল আলাদা আলাদা ইভেন্ট। ছিল আলোচনা-প্রদর্শনী। অংশগ্রহণকারীদের বেশিরভাগই এসেছিলেন দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো থেকে, তবে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো থেকেও যৌনকর্মীরা এসেছিলেন। সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন ২৫ হাজার মানুষ। শহরের অনেক নামকরা সাহিত্যিক, চলচ্চিত্র পরিচালক সম্মেলন শেষে বলেছিলেন সেই প্রথম তাঁরা যৌনকর্মীদের কাজ এবং জীবন সম্পর্কে জেনেছেন। এমনকী সম্মেলনের শেষ দিনে ভারতের তকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিল্লি থেকে কলকাতায় এসেছিলেন শুধু এই সম্মেলনে ভাষণ দিতে। তিনি পুলিশ ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে যৌনকর্মীদের হয়রানির সমালোচনা করেছিলেন। ওই সম্মেলন কলকাতার যৌনকর্মীদের জীবনে দীর্ঘস্থায়ী একটা প্রভাব রেখেছিল। সোনাগাছিতে বসবাসরত শিশুদের নিয়ে জানা ব্রিস্কি ও রফ কফমান তৈরি করেন ডকুমেন্টারি 'বর্ন ইনটু ব্রথেলস: ক্যালকাটাস রেড লাইট কিডস'। ফিল্মটি সেরা ডকুমেন্টারি হিসাবে ২০০৪ সালে অস্কার পুরস্কার জিতেছিল। তথ্যচিত্রটিতে উঠে এসেছে যৌনকর্মীদের শিশুদের অধিকারের প্রশ্ন, যাদের সমাজের বাসিন্দা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। জেনা ব্রিস্কির চেষ্টায় চারটি মেয়েশিশুর বোর্ডিং স্কুলে পড়বার সুযোগ হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় একজন ছাড়া বাকিরা চলে আসে সেই স্কুল থেকে। একজন পালিয়ে আসে। আর একজনকে তার মা ছাড়িয়ে নেয় স্কুল থেকে। বাকি শিশুদের মধ্যে অনেকের পরিবার জানায় যে তারা চায় না তাদের সন্তানেরা বোর্ডিং স্কুলে যাক, সোনাগাছির বাইরে পা রাখুক।

চালাতে পারেন না। কিন্তু তারপরেও আজও রাতে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের ওপর দিয়ে গেলে সোনাগাছির বাইরে বেরিয়ে এসে খদ্দের ধরতে দেখা যায় যৌনকর্মীদের অনেককেই। আর খবরের কাগজে বড় বড় বিজ্ঞাপন দিয়ে অভিজাত পাড়াগুলোয় গোপন এসকর্ট সার্ভিসের মধ্যে দিয়েই বেঁচে রয়েছে কলকাতার যৌনপল্লিগুলি।

এবার আসি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাওয়া যৌন ব্যবসার দিকে। এখন খবরের কাগজ কিনলেই ভেতরের দিকে কিছু বিজ্ঞাপনে চোখ আটকায়ই। সেখানে 'Hi Profile মহিলা', নিঃসঙ্গ অতৃপ্ত মহিলা', 'বোল্ড রিলেশন', 'বন্ধু হয়ে আয় করুন', 'গোপনে নিজের চাহিদা পূরণ করুন', 'প্রচুর আনন্দ করে ইনকাম করুন' ইত্যাদি শব্দ লেখা থাকে। তো বন্ধুত্বের বিজ্ঞাপনে ছবি হিসাবে কিন্তু থাকে সেক্সি নারী শরীরের ভঙ্গি। ফলে এই বিজ্ঞাপনের পণ্যটা ঠিক কী তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় কারওরই। এঁরা মেল এসকর্ট। পাশ্চাত্য আধুনিকতার অঙ্গ। আর তাদের সঙ্গেই দেখা যায় মেয়েরা বন্ধুত্ব করতে চায়, তারও বিজ্ঞাপন। এগুলোই আসলে এসকর্ট সার্ভিস। আপনি যখন যেভাবে চান, সেভাবেই সেখানেই পৌঁছে যাবে এই সব যৌনকর্মীরা। হোটেল-রিসর্ট বা নিজের বাড়ি যেখানে ক্লায়েন্ট চাইবে। হ্যাঁ, ক্লায়েন্ট! কারণ, এরা সাধারণ নন, কর্পোরেট যৌনকর্মী। সময় এবং চাহিদা অনুযায়ী এদের সঙ্গে সময় কাটানোর দাম নির্ধারিত হয়।

যৌনকর্মী মুক্ত একটা শহর বা রাজ্য বা দেশ গড়ে তোলা কি সত্যিই সম্ভব? নিজের ইচ্ছায় যৌনকর্মীর পেশা বেছে নেওয়ার অধিকারও রাষ্ট্র সকলকেই দিয়েছে। কিন্তু এই আন্দোলনের আলোর মধ্যেও একটা কালো দিক দেখাই

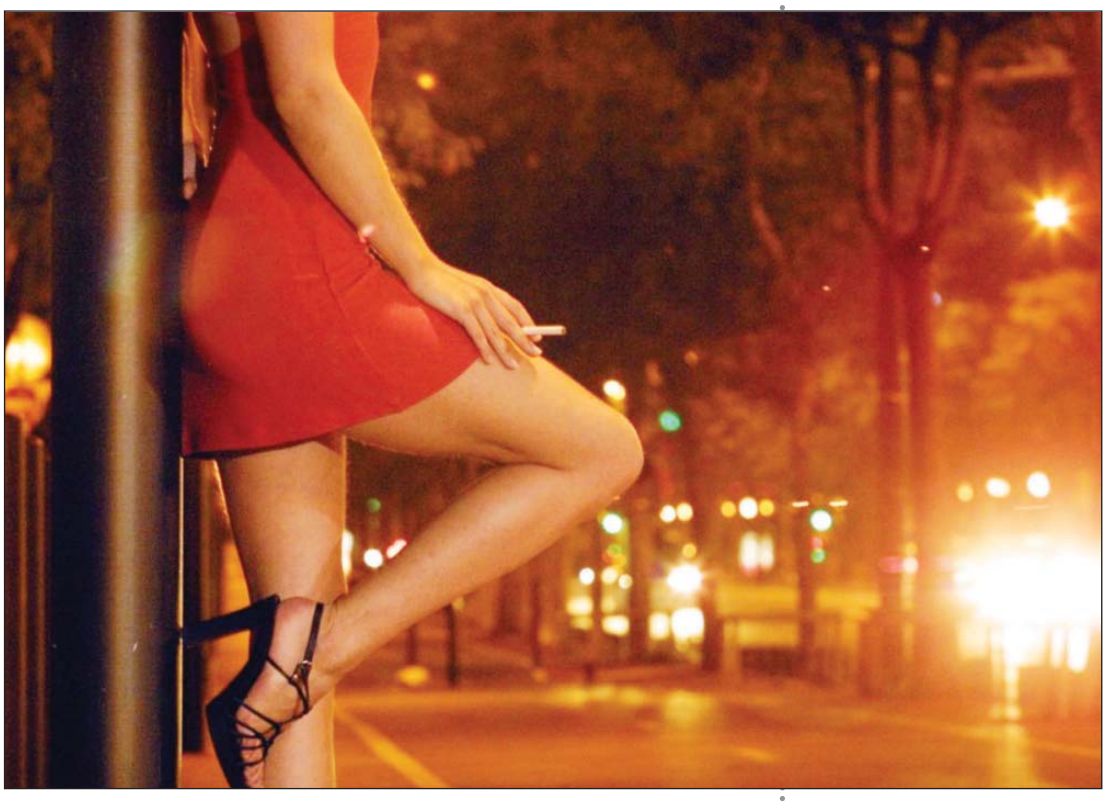

দুর্বারের আরও একটা সাফল্য হল ঊষা কো-অপরেটিভ নামে নিজেদের একটি সমবায় সংস্থা তৈরি করা। যৌনকর্মীদের অনেকেই দৈনিক রোজগার থেকে কিছু টাকা এই সংস্থায় জমা রাখেন এবং অসুখ-বিসুখ বা অন্য কারণে বাড়তি টাকার দরকার হলে এই সংস্থা থেকে অল্প সুদে টাকা ধার করতে পারেন। ঊষা কো-অপারেটিভের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ১০,০০০-এর কাছাকাছি এবং সারা বছর এর মাধ্যমে ২ কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয়। বর্তমানে 'দুর্বার' সংগঠনের সদস্যসংখ্যা প্রায় ৬৫ হাজার। দুর্বারের লাগাতার আন্দোলনের চাপে স্থানীয় গুণ্ডা-মস্তান, দালাল ও অন্যান্য দুষ্কৃতীরা আর যৌনকর্মীদের ওপর নিপীড়ন যাচ্ছে। তা হল, যৌনকর্মীদের অধিকারের দাবিকে সমর্থন করে বা তাদের হয়ে কাজ করে কেউ কেউ অতি সন্তর্পণে সমাজে বেশ্যাবৃত্তি পেশাটিকে প্রতিষ্ঠা দিতে চাইছেন না তো? কারণ, সোনাগাছির মতো জায়গায় কাজ করা এনজিওগুলির নামে বিদেশ থেকে কোটি কোটি ডলারের ফান্ডিং আসছে। সোনাগাছি না থাকলে তাদেরও কিন্তু টাকার ভাঁড়ারে ঘাটতি দেখা দেবে। এমন একদিনের জন্য কি আশা করা যায় না, যে দিন সমাজে জোর করে কাউকে এই পেশায় নামানো যাবে না। বর্তমান যৌনকর্মীদের ইচ্ছামতো পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হবে। এবং এই পাড়াগুলি অতীত হয়েই থেকে যাবে। সেই আশাতে বুক বাঁধা যেতেই পারে।

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১৯ জুন ২০১৭

যুগশঙ্খ SUPPLI team
ক ল কা তা
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **সুদীপ্ত বিশ্বাস, অতনু পাল**

নেপথ্য সমাজসেবায় মহিলামহল

মনীষা ভট্টাচার্য

চক্রবৎ ঘুরছে এই দুনিয়া। দিন, মাস, বছর এভাবেই কেটে যাচ্ছে যুগের পরে যুগ। পালটাচ্ছে পরিবেশ, প্রেক্ষাপট, প্রসঙ্গ। এই পরিবর্তনের মধ্যে যা স্থায়ী, যা অতি পরিচিত, তার অনেককিছুরই রূপ বদল হয়েছে, স্থান বদল হয়েছে, বদল হয়েছে নামও। রাস্তা-ঘাটের নাম বদলের কথা তো আমরা জানিই, রেলস্টেশন— তার নামও বদল হয়েছে অনেক, কিন্তু জানেন কি আমাদের কলকাতা আকাশবাণীর নাম পালটেছে? 'আকাশবাণী কলকাতা' শৈশবের সেই নস্টালজিয়ার নাম সম্প্রতি বদলে হয়েছে 'আকাশবাণী গীতাঞ্জলি' ও 'আকাশবাণী সঞ্চয়িতা'। ভ্রূকুটিতে খুব একটা কাজ হবে না, এই তথ্যটি সত্য। কলকাতা 'ক' প্রচার তরঙ্গের নাম হয়েছে 'আকাশবাণী গীতাঞ্জলি' ও কলকাতা 'খ' প্রচার তরঙ্গের নাম হয়েছে 'আকাশবাণী সঞ্চয়িতা'।

নতুন তথ্যের পাশাপাশি এবার সেই স্মৃতির পাতা ওলটাই যেগুলি আজ ইতিহাস। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে বেতারের বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানসূচির পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, 'মহিলামহল' শীর্ষক অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ওই বছর ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতার আগে ১৯৪৩ সালের ১৫ আগস্ট বাঙালি শ্রোতার জীবনে এক অন্য স্বাধীনতার ছোঁয়া দিয়েছিলেন ইন্দিরা দেবী। কলকাতা বেতারের প্রথম মহিলা ঘোষিকার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি। ইন্দিরাদি মানেই 'শিশুমহল', কিন্তু নাহ্, আজ শিশুমহল নয়, আজ স্মৃতিচারণ করব মহিলামহলের। এই অনুষ্ঠান পরিচালনায় পর্যায়ক্রমে এসেছেন মল্লিকা ঘোষ, নূরজাহান বেগম, মাধুরী বসু, রেখা দেবী (মেডন), বেলা দে— এঁদের মতো ব্যক্তিত্ব। এই বেলা দে মহিলামহল বিভাগ সামলেছেন প্রায় তিরিশ বছর। বেলা দে-র স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়, 'সে যুগে উত্তর কলকাতার এক বনেদি বাড়ির মেয়ে ও বনেদি পরিবারের বধূর বেতারে চাকরি করা পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনেরা ভালো মনে মেনে নিতে পারেননি, আড়ালে-আবডালে সবাই ছি ছি করে উঠেছিল।...আমার আগে থেকেই বেতারে কাজ করতেন ইন্দিরা দেবী। আবার সমসাময়িক ছিলেন নীলিমা সান্যাল। সেই সময় মহিলামহল পরিচালনা করতেন রেখা দেবী। দেশ বিভাগের পর রেখা দেবী দিল্লি চলে গেলেন। তারপর আমি মহিলামহল পরিচালনার ভার পেলাম।'

রান্নাবান্না, কেনাকাটা, রূপচর্চা, সাহিত্য সভা, নানা হাতের কাজের শিল্প, গ্রামে-গঞ্জে মহিলাদের উত্তরণের কথা, বিশেষ বিশেষ দিনে বিশিষ্ট মহিলা অতিথিদের স্টুডিওতে নিয়ে আসা— অর্থাৎ রাঁধা থেকে চুল বাঁধা, সব বিষয়ই আলোচিত হতো এই মহিলামহলে। বেলা দে লিখছেন, 'মনে পড়ে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্টের অনুষ্ঠানটি। সেদিন স্টেশনে অধিকর্তার নির্দেশে আমরা দেশবন্ধু-জায়া বাসন্তী দেবীর লাইভ ব্রডকাস্ট করেছিলাম। মনে আছে স্বামীর কথা বলতে গিয়ে বাসন্তী দেবীর কান্নার আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল। তবে খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভারতের স্বাধীনতা বাসন্তী দেবীকে খুশি করেনি।' শুধু বাসন্তী দেবী কেন, দেশভাগের মধ্য দিয়ে আসা স্বাধীনতায় কেউই খুশি হতে পারেনি। স্বাধীনতার খবর, স্বাধীন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, উদ্বাস্তুদের হাহাকার, এসব খবরই সময়ে সময়ে কলকাতা বেতার দিয়েছে। সে কথা অন্য কোনওদিন বলা যাবে।

ফিরে আসি আবারও বেলা দে-র কথায়। তিনি এবং নীলিমা সান্যাল মহিলামহলে এক সঙ্গে কাজ করতেন। কথোপকথনের মাধ্যমে নীলিমা সান্যাল ভালোই আসর জমিয়ে দিতেন। একদিন অনুষ্ঠান শেষ হতে বাকি সাড়ে চার মিনিট। বেলাদি বললেন, 'নীলিমা এসো এই সময়টা তোমার গান দিয়ে অনুষ্ঠানটা ভরিয়ে দিই।' কোনও বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই নীলিমা গান ধরলেন, 'আমার মন চেয়ে রয়, মনে মনে হেরে মাধুরী'। যাঁরা কাজ করতে ভালোবাসেন, তাঁরা ঝড়, জল, রোদ, বৃষ্টি সবকিছুকেই উপেক্ষা করতে পারেন। আসলে কাজের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা এই দুই থাকলেই কৃতকর্মের মান উন্নত হয়। তাই সেই সময় প্রায় সবাই বেতারে খুব মজা

নীলিমা সান্যাল

বেলা দে

করে, আনন্দ করে, নানা প্রতিকূলতাকে উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে সমাধান করে যা উপস্থাপন করতেন তাই হতো উৎকৃষ্ট।

লাইভ ব্রডকাস্টের সব থেকে বড় সমস্যা হল, সঠিক সময়ে স্টুডিওতে উপস্থিত হওয়া। মহিলামহল মূলত লাইভ ব্রডকাস্ট হতো। একবার মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ ভিজে স্টুডিতে এসে উপস্থিত হন বেলাদি। ওই অবস্থায় ঠান্ডা স্টুডিওতে লাইভ করেন আশাপূর্ণা দেবী, বাণী রায়, রাধারাণী দেবী, ড. উমা রায়-এর মতো সাহিত্যিকদের সঙ্গে। সেদিন ছিল মহিলামহলে সাহিত্য সভা। লাইভ শেষে আশাপূর্ণা দেবী বেলা দে-কে বলেন, 'বেলা সত্যিই তুমি রেডিওকে ভালোবাস, আশীর্বাদ করি আরও বড় হও।' শুধু নিজের দেরি হওয়া নয়, অতিথিদের দেরিতেও, ব্রডকাস্টে সমস্যা হয়। একবার কাননদেবী নির্ধারিত সময়ের অল্পকিছু আগে এসে উপস্থিত হন। চিন্তায় চিন্তায় বেলা দে অস্থির হয়ে উঠেছেন। এমন সময় হাসি মুখে এক গোলাপের তোড়া হাতে নিয়ে স্টুডিওতে ঢোকেন শিল্পী। তারপর তো সবই যেন খুব সহজে উতরে যাওয়া। অন্যদিকে এমনও হয়েছে, অতিথি এসে পৌঁছতে পারেননি, তখন বেতারের স্টাফদের মধ্যেই কাউকে নিয়ে শুরু করেছেন মহিলামহল। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এসব ব্যাপারে ছিলেন খুবই সাবলীল। নানা মজার মজার গল্পে ভরিয়ে তুলতেন নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে মহিলামহল।

নানা বৈচিত্র ছিল এই অনুষ্ঠানে। 'কবির মানসী প্রিয়া' নামের এক ধারাবাহিক উপস্থাপন করেছিলেন বেলাদি। প্রতি মাসে দুদিন 'ঘরে বাইরে' শীর্ষক অনুষ্ঠান সম্প্রচার হতো। দেশ-বিদেশের মেয়েদের কথা, বিশেষ করে গ্রামের মেয়েদের কথা এই অনুষ্ঠানে বারে বারে আলোচিত হয়েছে। নারী প্রগতির কথা মাথায় রেখেই এই অনুষ্ঠান সাজানো হতো বলে জানিয়েছেন বেলা দে। ইন্দিরা গান্ধী তখন তথ্য ও বেতার মন্ত্রী। এক বিশেষ কারণে তাঁর সঙ্গে আলাপ হতে, তিনি বেলা দে-কে সস্নেহে বলেছিলেন, 'তুমি তো নেপথ্যে সমাজ সেবিকা।'

সমাজকে সুন্দরভাবে এগিয়ে যেতে হলে নারী-পুরুষ দুজনকেই হাতে হাত রেখে চলতে হবে। সমাজ যদি পাখি হয়, তাহলে তার একটি ডানা স্বাধীন হলে চলবে না। এমন কথার প্রতিফলন আশাপূর্ণা দেবীর 'সুবর্ণলতা'-য় বারে বারে দেখা গেছে। সেই অর্ধেক আকাশ নিয়ে মহিলামহল আজও আকাশবাণীর প্রচারতরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়। আজকের সাম্প্রতিকতম বহু ঘটনাও উঠে আসে সেই তরঙ্গে। আজও নেপথ্যে থেকে, নারীদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে কলকাতা বেতার। আছে তার মহিলামহল।

সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা

পান্থজন

চলতে চলতে পায়ে পায়ে পৌঁছে গেলাম সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে। চিৎপুর রোডের ওপরেই এই মন্দির। যাওয়ার উদ্দেশ্য দেখা এবং জানা। ইতিহাসের খোঁজেই তো পথে বেরিয়েছি। সুতরাং সেরকমই খোঁজ-খবর করতে ঢুকে পরলাম মন্দিরের ভেতরে। অনুমান করা হয়, ১৬০০ সালে কালীবর নামের এক সাধক বর্তমানের কুমোরটুলি অঞ্চলে এই সিদ্ধেশ্বরী মাকে নিয়মিত পুজো করতেন। অতীতে এই পথ ধরেই তীর্থযাত্রীরা যেতেন কালীঘাটে। যাবার পথে জঙ্গলের মধ্যে পড়ত এই মন্দির। জায়গাটি মন্দিরের রূপ পায় সম্ভবত ১৩৩৭ সালে বা তার আগে-পরে। কালীমন্দিরের উলটোদিকে রয়েছে শিবমন্দির। জনশ্রুতি আছে, ওই বছরই কলকাতা শহরে

ঝড়, বৃষ্টি এবং ভূমিকম্পে বড় ধরনের বিপর্যয় হয়। সেই বিপর্যয়ের ফলে মন্দির দুটির উচ্চতা বেশ কিছুটা খর্ব হয়। বাংলার নবাব তখন বোধহয় আলিবর্দি খাঁ আর দিল্লির মসনদে মোঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ।

মনে প্রশ্ন জাগে, সাধক কালীবরের পূজিত এই মাতৃমূর্তিকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করলেন কে? অবশ্য ইতিহাস থেকে জানা যায় যে কুমোরটুলি অঞ্চলে জমিদার মিত্র পরিবার, যিনি 'ব্ল্যাক জমিন্দার' নামে অধিক পরিচিত সেই গোবিন্দরাম মিত্র নাকি হোগলাপাতার ছাউনি থেকে আজকের এই মন্দির তৈরি করে মা সিদ্ধেশ্বরী কালীকে প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দির যেহেতু বাগবাজার অঞ্চলের খুব কাছেই, তাই অনেকেই একে 'বাগবাজার সিদ্ধেশ্বরীতলা' বলে অভিহিত করেন। এও জানা যায় যে, বলরাম বসুর বাড়িতে যখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আসতেন তখন মাঝে মাঝেই এই মন্দিরেও আসতেন। মাতৃবিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে সেই সময় তিনি বলেছিলেন, এখানকার সিদ্ধেশ্বরী মাকে যদি ডাব-চিনি দিয়ে পুজো দেওয়া হয়, তাহলে মা সব মনোবাসনা পূর্ণ করবেন। মিত্র পরিবার এই মন্দির নির্মাণ করলেও তাঁদের কালীপুজো করবার অধিকার সেই সময় ছিল না।

সেই কারণেই হয়তো কোনও ব্রাহ্মণ পরিবারের হাতে এই পুজোর দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়। সম্ভবত সেই সময় থেকেই বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার মন্দিরের সেবাইত হিসাবে নিযুক্ত হয়ে পুজোর দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বর্তমানে এই সেবার শরিক রয়েছেন তিনজন। সারা বছর ধরেই মায়ের নিত্যপুজো চলে। দীপান্বিতা অমাবস্যায়, কালীপুজোর দিন মন্দিরে এখনও একটি ছাগবলির প্রথা রয়ে গেছে। এছাড়াও বুদ্ধ পূর্ণিমায়, ফুলদোলে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে ফলহারিণী কালীপুজো এই মন্দিরের উল্লেখযোগ্য উৎসব। প্রায় তিনশো বছর আগে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা মন্দিরের সামনে দিয়েই প্রবাহিত হতেন। বর্তমানে ভাগীরথী সরে গেছেন কিছুটা দূরে। তার তীরেই নির্মিত হয়েছে কাশী মিত্র শ্মশানঘাট।

প্রতি বছর পুজোর সময় এই এলাকায় পথ চলা দায় হয়ে ওঠে, কারণ চিৎপুর রোডের অদূরেই আয়োজিত হয় বিখ্যাত দুটি দুর্গোৎসব— একটি 'কুমোরটুলি সর্বজনীন', অন্যটি শহরের অন্যতম প্রাচীন বারোয়ারি 'বাগবাজার সর্বজনীন'। সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের পাশেই রয়েছেন গোবিন্দ মিত্তির প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন। পরের সংখ্যায় থাকবেন এই মদনমোহন।

ফোটো: লেখক

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা যতটা মানবিক বাস্তবে কি ঠিক ততটাই?

তন্ময় মণ্ডল

প্রতিনিয়ত সভ্যতা ধাপের পর ধাপ এগিয়ে যাচ্ছে। সময়ের সাথে সাথে পালটে যাচ্ছে মানুষের চাহিদা বা প্রয়োজনীয় উপকরণসামগ্রী। প্রযুক্তি এগোচ্ছে ক্রমাগত। মানুষ এখন পুরোপুরি প্রযুক্তিনির্ভর। এই জীবনযাত্রায় অনেক নতুন অভ্যাস তৈরি হচ্ছে প্রতিদিন। সেই অভ্যাসগুলোর মধ্যে অন্যতম সোশ্যাল মিডিয়াতে কানেক্টেড থাকা। মানুষের জীবনে সোশ্যাল মিডিয়া এখন এমন একটা মাধ্যম, যেখানে মোবাইলের ছোট্ট উইন্ডো বা কম্পিউটারের স্ক্রিন একটা পরিবারের মতো বা খানিকটা সোসাইটির মতো। সেখানেও ভালোলাগা আছে, খারাপলাগা আছে, আছে আলাপ-আলোচনা; তবে তা পুরোটাই যন্ত্রনির্ভর। নিমেষের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরি করা যাচ্ছে এক গোলার্ধ থেকে আর এক গোলার্ধে। বাধা কিছু নেই। মনের কথা শেয়ার করার জন্য কয়েক সেকেন্ডই যথেষ্ট। তাই আজকের জীবনযাত্রার খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এই মাধ্যম। কোনও বিষয় নিয়েও আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের অন্যতম মাধ্যম সোশ্যাল মিডিয়া। সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা পরিসর আছে, আছে সম্পর্ক গড়ে ওঠা, বন্ধুত্ব, বিচ্ছেদ, অন্যায়ের প্রতিবাদ, বিপদে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়াবার প্রতিশ্রুতি। তবে প্রশ্ন হল সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা যতটা মানবিক দেখাই নিজেদের, বাস্তবে কি ঠিক ততটাই মানবিক আমরা? নাকি সোশ্যাল মিডিয়া আর বাস্তবের চরিত্রের মধ্যে রয়েছে বিরাট ফারাক? সেই নিজেই আজকের যুক্তি-তর্ক-আড্ডা।

তনিমা ঘোষ (ছাত্রী): সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা যতটা মানবিক দেখাই নিজেদের অতটা আমরা নই। আসলে ভার্চুয়াল জগৎটা নিজেদের অন্যভাবে প্রকাশ করার একটা অন্যতম মিডিয়াম। কোথাও নারী নির্যাতন হয়েছে শুনে যাঁরা ছিঃ ছিঃ করেন তাঁদের মনে কিন্তু একটা লোলুপ প্রবৃত্তি কোথাও না কোথাও সুপ্ত থাকে। আসলে পুরোটাই নিজেকে প্রোজেক্ট করার ব্যাপার। কোনও খারাপ ঘটনা ঘটলে যাঁরা কমেন্টে লিখছেন 'সমবেদনা জানাই', তাঁরা যে কী সমবেদনা জানাতে চান তাঁরাই জানেন। আসলে সোশ্যাল মিডিয়া মানে একটা ফর্মালিটি। তার সাথে বাস্তবের ফারাক অনেক, আর মানবিকতার কোনও প্রশ্নই আসে না।

রুমুন চক্রবর্তী (গৃহবধূ): আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে নিজেদের যতটা মানবিক দেখাই আদতে আমরা ততটা মানবিক নই। সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন আমরা আসি তখন আমাদের অবচেতনে একটা চিন্তা কিন্তু সবসময় কাজ করে যে আমাকে প্রচুর মানুষ একসঙ্গে দেখছে। এটা প্রতিটা মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি যে, একটা ভালো মানুষ হিসাবে সবার সামনে

নিজেকে উপস্থাপিত করা। এই চিন্তার বশবর্তী হয়েই সোশ্যাল মিডিয়াতে এসে আমরা সবসময় ভালো ভালো কথা বলি। আমাদের মতো দয়ালু, আমাদের মতো নির্ভীক, আমাদের মতো সোশ্যাল রিফর্মার আর যেন দ্বিতীয়টি কেউ হয় না। কারণ, আমরা জানি ওই ভালো ভালো কথাগুলো বললে সামনের মানুষগুলোর কাছে নিজের খুব ভালো একটা ছবি আঁকতে পারব। কিন্তু সেই মানুষটা যখন সোশ্যাল মিডিয়ার বাইরে অর্থাৎ বাস্তবে এসে দাঁড়াচ্ছে তখন সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী তার লাভ-ক্ষতিগুলোই বড় হয়ে দেখা দেয়। সেখানে মানবিক মূল্যবোধের কোনও জায়গা নেই। হয়তো যে মানুষটি সোশ্যাল মিডিয়াতে কেউ কাউকে ঠকিয়েছে জেনে, অতগুলো মানুষের কাছে নিজের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি তৈরির জন্য বলছেন, 'এটা খুব জঘন্য ব্যাপার, এই সমস্ত মানুষদের আমি ঘেন্না করি'; সে-ই বাস্তবে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাউকে না কাউকে ঠকাচ্ছে। তাই সোশ্যাল মিডিয়াতে যে মুখ আমরা দেখি বাস্তবে তা আকাঙ্ক্ষা করা নির্বুদ্ধিতার সমান। এই ভার্চুয়াল জগতে মানবিক রূপ দেখালে তার অনেক সাক্ষী থাকে। আর না দেখালে তারও সাক্ষী থাকে। কিন্তু বাস্তব জগতে আমরা কতটা খারাপ হচ্ছি, কতটা অমানবিক হচ্ছি, তা তো পুরোটাই আড়াল।

সুপ্রিয় হাজরা (অধ্যাপক): আমাদের জীবনের সাথে সোশ্যাল মিডিয়া এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে ওটা বাদ দিয়ে এখনকার জীবন অসম্পূর্ণ। এখনকার মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট না থাকলেও চলবে কিন্তু ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট থাকাটা আবশ্যিক। এবার আসি মানবিকতার প্রসঙ্গে, আসলে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা যে মানবিকতা দেখাই তার বেশিরভাগটাই কৃত্রিম, লোকদেখানো। অনেকের ক্ষেত্রে হয়তো উনিশ-বিশ হয় তবে সে সংখ্যা খুবই কম। মূলত ওই জগতটা এমন একটা জগত যেখানে নিরপেক্ষ থাকাটা, লোকের কাছে নিজেকে ভালো প্রমাণ করাটাই মানুষের বেশি প্রেফারেবল বলে মনে হয়। তবে এমন উদাহরণও আমার জানা আছে যেখানে একটি অসুস্থ বাচ্চার চিকিৎসার খরচ জোগাড় করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচিত বেশ কিছু মানুষ মিলে।

কৌশিক পাল (আইটি কর্মী): আমার মনে হয় এই মিডিয়াম অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড। আর মানবিকতার প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলতে হবে ভালো-খারাপ দু'ধরনের মানুষই তো আছেন, অনেকে হয়তো সিমপ্লি ফর্মালিটির জন্য কোনও বিপদে পড়া মানুষকে বলে দেন যে পাশে আছি; তবে এমন মানুষও আছেন যাঁরা সত্যিই বিপদে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ান। বাস্তব বা ভার্চুয়াল এই ব্যস্ততার যুগে মানবিকতা শব্দটা দু'জায়গাতেই অনেকটা ফিকে হয়ে গেছে। মানুষ নিজেকে নিয়েই এত ব্যস্ত অন্যকে নিয়ে ভাববার সময় কোথায়?

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১৯ জুন ২০১৭

প্রয়োজনে লাগতে পারে

সেন্ট জন্স অ্যাম্বুলেন্স - ২২৪৮৫২৭৭

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (অ্যাম্বুলেন্স) - ২২৩৯২২৩২, ২২৩৯২২৩৩

বেল ভিউ নার্সিং হোম - ২২৪৭৭৪৭৩, ২২৪৭২৩২১

কোঠারি মেডিক্যাল সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট - ২৪৫৬৭০৫০, ২৪৭৯২৫৬১

ক্যালকাটা হসপিটাল অ্যান্ড মেডিক্যাল রিসার্চ - ২৪৫৬৭৭০০, ২৪৭৯১৮০৫

এসএসকেএম হসপিটাল (পিজি) - ২২২৩৬০২৬, ২২২৩৬২৪২

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ১৯ জুন ২০১৭

এই ক্রোড়পত্রের সমস্ত লেখার মতামতই লেখকদের নিজস্ব।

ইচ্ছে ছিল রামমোহন রায়ের বাড়িটা দেখার

মোশারফ মাতুব্বর (সমাজকর্মী)

কলকাতা শহরটির সাথে আমার অনেক আবেগ জড়িয়ে আছে। যখন ছোট ছিলাম ভাবতে খুব অবাক লাগত অন্য একটা দেশ, সেখানের মানুষও বাংলা ভাষায় কথা বলে। পরে যখন বড় হয়েছি বুঝেছি আসলে বেড়াটা শুধুই কাটাতারের হৃদয়ে দুই বাংলা অভিন্ন। ছোটবেলা থেকেই তাই কলকাতা শহরটাকে কাছ থেকে দেখবার বড় সাধ ছিল।

যেদিন আমার প্রথম কলকাতা যাবার দিন সেদিন সারা বাংলাদেশ জুড়ে স্ট্রাইক। রাস্তায় দীর্ঘ জ্যামে আটকে থেকে দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে আসলাম সাতক্ষীরার নাভারণ। সেখান থেকে পুনরায় বাসযোগে বেনাপোল। কিন্তু এখানে এসেও মাথায় হাত। কয়েক হাজার লোক বর্ডার ক্রস করতে লাইনে দাঁড়িয়ে। অফিশিয়াল কার্যপ্রণালি সেরে ওপার যেতে যে পথ ১০ মিনিটে ফুরায় সেখানেই লাগল প্রায় দেড় ঘণ্টা। তবে শত বিড়ম্বনার পর পৌঁছলাম শহর কলকাতায়। আমার সঙ্গী ছিলেন আমার সহকর্মী রিয়াজ আহমেদ রিপন ভাই।

বর্ডার পার হয়ে উঠলাম কলকাতার অটোতে। উদ্দেশ্য বনগাঁও রেল স্টেশন। সেখান থেকে কাটলাম শিয়ালদহ স্টেশনের টিকিট। রিপন ভাইয়ের সঙ্গে উঠলাম কলকাতার ট্রেনে। এ কামরা ও কামরা ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে দুইজনের দুটো সিট পেলাম অনেকটা ভাগ্যের জোরেই। দুপুর আড়াইটায় চলতে শুরু করল ট্রেন। বনগাঁ থেকে শুরু করে চাঁদপাড়া, ঠাকুরনগর, গোবরডাঙা, হাবরা, অশোকনগর, গুমা, বিড়া, দত্তপুকুর, বামনগাছি, বারাসাত, হৃদয়পুর, মধ্যমগ্রাম, দমদম জংশন হয়ে মোট ২২টি স্টেশন ঘুরে আমরা নামলাম বিধাননগর।

সেবার আমাদের যাওয়ায় কারণ ছিল দুই বাংলার এনজিও ফোরামের প্রায় সাড়ে তিনশো এনজিও মিলে একটা কনফারেন্সের আয়োজন হয়েছিল কলকাতায়, সেখানেই যোগ দিতে। কলকাতায় আমাদের পরিচিত সুশান্ত বক্সী দাদা ছিলেন, এখানে কনফারেন্সটি যিনি হোস্ট করছেন তিনি বিধাননগর স্টেশনে গাড়ি পাঠালেন। আমি আর রিপন ভাই সেই গাড়িতে করেই বাগুইহাটি পৌঁছলাম। সেখানে রাতে দাদার বাসায় আমাদের দুই দেশের বিভিন্ন স্তরে কী করে কার্যাবলি আরও ভালোভাবে করা যেতে পারে তা নিয়ে অনেক আলোচনা করলাম। পরেরদিন সকাল থেকে কলেজ স্ট্রিট লাগোয়া ঐতিহ্যবাহী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনার হলে কনফারেন্স হল। ভারত, বাংলাদেশ, নেপালসহ সার্কের প্রায় সব কটি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছিলেন এতে।

সেমিনারের পরেরদিন আমাদের ফেরার কথা। সুশান্তদার আবদারে থেকে গেলাম। পরেরদিন ঘুরলাম কলকাতার বেশ কয়েকটা জায়গা। কলকাতা দেখা শুরু হল মনোরম

রামমোহন রায়ের বাড়ি

ইকোপার্ক দিয়ে, তারপর সেখান থেকে চলে গেলাম কফি হাউস। একেবারে যেন দুই প্রান্ত একটা শান্ত-স্নিগ্ধ আরেকটা জমজমাট। সেখানে আড্ডা হল তারপর সেখান থেকে সোজা যাদুঘর, তারপর ময়দান-রবীন্দ্রসদন। সন্ধ্যায় আইনক্সে সিনেমা দেখে বাসায় ফিরলাম। অসম্ভব সুন্দর সে স্মৃতি। তার পরদিন রওনা দিলাম দেশের উদ্দেশে।

অত বড় শহর কলকাতার খুব একটা ঘুরে দেখার সৌভাগ্য হয়ে ওঠেনি আমার। তবে সেখানকার অনেক মানুষের সাথেই আলাপ হয়েছিল। তাঁদের আন্তরিকতা ভোলবার নয়। আমার খুব ইচ্ছে ছিল রাজা রামমোহন রায়ের বাড়িটা একবার দেখাবার। পাশ দিয়ে চলে গেছি তবে দেখা হয়নি। ওটা একটা চূড়ান্ত আক্ষেপ। এরকম আরও অনেক আক্ষেপ জমা হয়ে আছে। পরে যখন যাবো আরও সময় নিয়ে উপভোগ করব দৃষ্টিনন্দন কলকাতাকে।

ঋত্বিক ঘটক

সোমনাথ আদক

প্যারাডাইস ক্যাফে। ছোট্ট চায়ের দোকান। কয়েকটা ভাঙাচোরা চেয়ার-টেবিল-কাপ-প্লেট; আড্ডা জমে উঠেছে। ঘনঘন চা খেতে খেতে একজন বলেছেন, 'জ্বালা আমারও কম নয়। ব্যথা আমারও আছে!' বলতে-বলতেই একটা বিড়ি ধরালেন। সেই ব্র্যান্ড, লালু-তো। বিক্ষুব্ধ সময়ের দেশভাগ থেকে কলোনির জীবন, দাঙ্গা-বিধ্বস্ত বাংলার গল্প শুনছেন সলিল চৌধুরী, হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, তাপস সেন, মৃনাল সেন।

কখনও উত্তেজিত তাঁর কণ্ঠস্বর '...মাতামাতি! বাংলাকে ভেঙে চুরমার করে দিল, আর মাতামাতি! বিক্ষুব্ধ সময়ে মুজরো করব?...চাই খুব বেশি করে চাই দুই বাংলার সংস্কৃতিকে এক ফ্রেমে আঁটতে। তাতে তোমরা আমাকে মার্ক্সবাদী বলো আর যাই বলো। প্রতিবাদ করাটা খুব দরকার। কিন্তু শালা কেউ বুঝলো না।' একটা অস্বস্তি তাঁকে তাড়া করছে। কোথাও যেন শান্তি নেই। তিনি ছুটছেন। হ্যাঁ, তিনিই চিত্রপরিচালক ঋত্বিক ঘটক। জন্ম নভেম্বর ৪, ১৯২৫ ঢাকা শহরের জিন্দাবাজারের ঋষিকেশ দাস লেনে। বাবা সুরেশচন্দ্র ঘটক ও মা ইন্দুবালা দেবী। পড়াশোনার শুরুটা ময়মনসিংহের মিশন স্কুলে। অষ্টম শ্রেণিতে পড়তে পড়তে শ্রমিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৬-এ রাজশাহী কলেজ থেকে আই.এ, ১৯৪৮-এ বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বি.এ ডিগ্রি

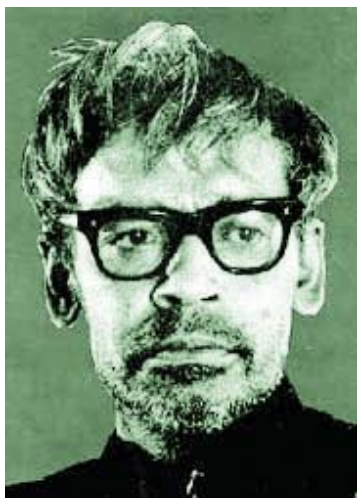

নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এম.এ-তে ভর্তি হলেন। এসময় তাঁর নাওয়া-খাওয়া নেই। বের করলেন 'অভিধারা'। ওই কাগজ এবং 'দেশ', 'অগ্রণী', 'শনিবারের চিঠি'-তে লিখলেন একের পর এক গল্প, নাটক। তারমধ্যে 'গাছ', 'চোখ', 'কমরেড', উল্লেখ্য। প্রথম গল্প বেরোয় ১৯৪৭-এ, 'গল্পভারতী'তে। যদিও তাঁর লেখালিখির হাতেখড়িটা প্রেমের কবিতা দিয়েই। হলে কি হবে তাঁর লক্ষ্য যে লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছান। তাই একসময় মনে হল, গল্পটা inadequate। বললেন, গল্পটা কজন লোককে নাড়া দেয়, আর নাড়া দেয় অনেক গভীরে গিয়ে, কাজেই অনেক সময় লাগে পৌঁছতে। 'আমার তখন টগবগে রক্ত। immediate reaction চাই। সেই সময় হল 'নবান্ন'। 'নবান্ন' আমার সমস্ত জীবনধারা পালটে দিল।...আমি নাটকের দিকে ঝুঁকে পড়লাম।' ওই সময় তিনি নাটক লিখছেন, অভিনয় করছেন, আবার পরিচালনা করছেন। ১৯৪৮-এ প্রথম নাটক লিখলেন 'কালসায়র'।১৯৫১-তে ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগ দিলেন। বের্টোল্ট ব্রেশট ও নিকোলাই গোগোল-এর রচনাবলি বাংলায় অনুবাদ করলেন। ১৯৫৭-তে বিমল রায়ের 'জ্বালা' নাটকটি লিখলেন এবং পরিচালনা করলেন। এটিই তাঁর পরিচালনায় শেষ নাটক।

১৯৫১-তে নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল' সিনেমায় অভিনয় এবং সহকারী পরিচালনার মধ্যে দিয়ে চলে এলেন চলচ্চিত্র জগতে। উৎপল দত্ত-র কথায়, 'ঋত্বিক যখন থিয়েটার করত, তখন ও ছবি করার কথা ভাবত।' এর দু'বছর পর তাঁর একক পরিচালনায় মুক্তি পায় 'নাগরিক'। এই দুটি ছবিই ভারতীয় চলচ্চিত্রের গতানুগতিক ধারাকে জোর ধাক্কা দিল। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৬০), 'কোমল গান্ধার' (১৯৬১), 'সুবর্ণরেখা' (১৯৬২) অন্যতম। এর মাধ্যমে কলকাতার তৎকালীন অবস্থা এবং উদ্বাস্তু জীবনের রূঢ় বাস্তবতা চিত্রিত হয়েছে। আবার সিনেমা করতে করতে তিনি ভাবতেন আরও better option-এর কথা।

তিনি বলেন, 'আমি একটি 'জিগজ্যাগ' পথ ধরে ফিল্মে এসে পড়েছি, সিনেমা করবো বলে আসিনি। কাল যদি সিনেমার থেকে better medium বেরোয় তাহলে সিনেমাকে লাথি মেরে চলে যাব। I don't love film. সিনেমার প্রেমে মশায় আমি পড়িনি।' কিন্তু প্রেমে পড়লেন শিলং পাহাড়ের একটি মেয়ের, নাম সুরমা। অনেকটা বেকার যুবকের ঘর বাঁধার স্বপ্নের ছবি 'নাগরিক'-এর মতো। ১৯৫৫-র বৈশাখে বিয়ে করলেন তিনি।

ঋত্বিক তখন বোম্বেতে। বিমল রায়ের 'মধুমতী' আর হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের 'মুসাফির'-এর স্ক্রিপ্ট করতে করতেই স্ত্রীকে লিখলেন, 'দশটা-পাঁচটা গিয়ে বসে থাকতে হবে।... দাঁতে দাঁত চেপে শুধু পয়সার জন্য এখন চেষ্টা করা।... দেখো লক্ষ্মী এ জীবন আমাদের নয়। ...এ সব ছেড়ে দেব। এ হবে না!' ছেড়ে দিলেন চাকরি। চলে এলেন কলকাতায়। ১৯৬৫-তে পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে ভিজিটিং প্রোফেসর হিসাবে ডাক পেলেন। গেলেনও। ওখান থেকে সুরমা দেবীকে লিখলেন, 'এখানে সম্মান, বাঁধা মাইনে এবং মনের মতো কাজ।' ভাইস প্রিন্সিপালও হলেন। কিন্তু সব কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল নেশার খপ্পরে। কোথাও যেন শান্তি পাচ্ছেন না ঋত্বিক। নদীর গতিধারা তাঁকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবির মধ্যে দিয়ে এক বাংলাদেশি প্রযোজকের হাত ধরে আবার ফিরলেন চলচ্চিত্র জগতে। ১৯৭৩-এ মুক্তি পেল ছবিটি। ১৯৭৪-এ তাঁর শেষ ছবি 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'। ১৯৫১ থেকে ১৯৭৫-এর মধ্যে অনেক ছবি শুরু করলেও শেষ করতে পারলেন না। যেমন— 'বেদেনি', 'কত অজানারে', 'বগলার বঙ্গদর্শন', 'রঙের গোলাপ', 'রামকিংকর'।

১৯৭০-এ ভারত সরকার তাঁকে শিল্পকলায় পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করলেন। ওই বছরই 'হীরের প্রজাপতি' চলচ্চিত্রের জন্য ১৬তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেলেন। ১৯৭৪-এ 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'-র শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ও 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর জন্যও সেরা পরিচালক বিভাগে পুরস্কার পেলেন।

নাট্যকার বিজন ভাট্টাচার্যের মতে, 'ঋত্বিক সবসময় একটা কিছু হয়ে উঠতে চাইত।...শ্মশানের মাঝখানে বসে কাপালিক ঋত্বিককে কি আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছি? ঋত্বিক খেল মদ আর বিষক্রিয়া হল আমাদের। এখনো প্রলাপ, শত আলাপ। মাঝখানে হঠাৎ একদিন চেয়ে দেখি করোটি ও কারণ নিয়ে ঋত্বিক আর শবাসনে বসে নেই। শ্মশান ছেড়ে পালিয়েছে।'

পালানো যাঁর বরাবরের স্বভাব তাঁকে ধরে রাখবে কে? ছোটবেলায় স্কুলের জানলা দিয়ে সেই পালানো শুরু। তারপর কবিতা থেকে, গল্প থেকে, নাটক থেকে এমনকী সিনেমা থেকেও তিনি পালালেন। আর যেতে-যেতে যেন বলে গেলেন,'লক্ষ্মী! টাকা থাকবে না। কাজটাই থেকে যাবে। তুমি দেখে নিও...'